স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

প্রকাশকের কথা...

প্রতিটি মানুষই দ্বীনি ফিতরতের ওপর জন্ম নেয়। সবার মাঝেই নিহিত থাকে সত্যকে মানার সহজাত প্রবণতা। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব আর দুনিয়ার মোহ-মায়ায় অনেকেই ভুলে যায় নিজের আসল পরিচয়। অজ্ঞতা-উদাসীনতার নিকষ কালো আঁধারে ছেয়ে যায় তাদের জীবন-সময়। মূলত ভ্রষ্টতার ঘোরে আচ্ছন্ন থাকার কারণেই তারা ভুল পথে সফলতা আর সুখ-শান্তি খুঁজে বেড়ায়। মরীচিকার পিছু ধাবমান এ মানুষগুলো যখন দুনিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পায়, কাছ থেকে যখন তারা ক্ষণিকের এই জীবন-সফরের মানে উপলব্ধি করার প্রয়াস পায়, তখনই—হাঁ, তখনই তারা পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে সত্যের পানে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়।...

প্রিয় পাঠক, আরববিশ্বের খ্যাতিমান লেখক শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম তার অনন্য সাধারণ উপহার 'আজ-জামানুল কাদিম' গ্রন্থে বেশ কয়েকটি চমৎকার শিক্ষণীয় গল্প তুলে ধরেছেন, যাতে রয়েছে সত্যান্বেষীদের জন্য দারুণ কিছু ম্যাসেজ। 'স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে' নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা রুহামা পরিবার সত্যিই আনন্দিত। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এর থেকে পাঠকদের উত্তম শিক্ষা গ্রহণের তাওফিক দান করুন, আমিন।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

বই	স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ২৪০ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ লেখক ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম-এর অনন্য সাধারণ এক গ্রন্থ 'আজ-জামানুল কাদিম'। তার সত্তরের অধিক রচনার মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তিন খণ্ডে রচিত এই বইটি মূলত একটি ছোটগল্প সংকলন। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনাশৈলী সহজেই পাঠকের নজর কাড়ে। শাইখের স্বভাবজাত ভাষা-মাধুর্য মনের অজান্তেই টেনে নিয়ে যায় অনুভবের দুনিয়ায়—নাড়া দেয় অনুভূতির মর্মমূল ধরে। দুনিয়া, কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির মতো মৌলিক ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোকে উপজীব্য করে তিনি কলমের নিখুঁত আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অনেকগুলো দৃশ্যপট। সবর, শোকর, সাদাকা, তাওবা, দাওয়াত, তিলাওয়াত ইত্যাদির আলোচনাও বারবার এসেছে ঘুরেফিরে। গল্পের ছলে তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছেন হৃদয়ের সুপ্ত উপলব্ধিকে—কান পাতার অনুরোধ জানিয়েছেন অনন্তের আহ্বানে।

একদিন থেমে যাবে জীবনের কোলাহল। মায়াবী এই জগৎ ছেড়ে সবাই পাড়ি জমাবে না ফেরার দেশে। যেখানে গাঢ় হয়ে আছে কবরের নিকষ কালো আঁধার, ওত পেতে আছে কঠিন সব আজাব আর অবর্ণনীয় শাস্তি। পদে পদে জমে আছে অজানা বিভীষিকা। যেকোনো মুহূর্তেই বিদায়ের ডাক এসে যেতে পারে যে কারোই। তাই এই কঠিন পথের পাথেয় সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়। কিন্তু পার্থিব জীবনের রূপ-রস-গন্ধে সারাক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে মানুষ। পরকালের প্রস্তুতির কথা বেমালুম ভুলে যায় তারা। তাই মাঝে মাঝে তাদের মনে করিয়ে দিতে হয় জীবনের পরম পরিণতির কথা। শোনাতে হয় সুখময় জান্নাতের গল্প—সতর্ক করতে হয় জাহান্নামের বিভীষিকাময় অগ্নিকুণ্ড থেকে। শাইখ গল্পে গল্পে এই কাজটি করারই সফল প্রয়াস পেয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

প্রতিটি গল্পেই শাইখ পাঠকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন হৃদয় জাগানিয়া কোনো আহ্বান কিংবা অন্তরে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন মূল্যবান কোনো উপলব্ধি অথবা সতর্ক করেছেন চারিত্রিক কোনো অবক্ষয় থেকে। তাই প্রতিটি গল্পেই আপনি খুঁজে পাবেন মূল্যবান একটি ম্যাসেজ।

বইটির অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা পাঠকদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। তিন খণ্ডে সংকলিত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বারোটি, দ্বিতীয় খণ্ডে চোদ্দোটি এবং তৃতীয় খণ্ডে নয়টি গল্প আছে। আমরা সবগুলো গল্প আনার প্রয়োজন বোধ করিনি। যেসব গল্পের ম্যাসেজ অভিন্ন সেগুলো থেকে আমরা সুন্দর একটি গল্প বাছাই করেছি। কোনো গল্প খুব বেশি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণেও বাদ পড়েছে। আবার কিছু গল্পের ম্যাসেজ আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেও নির্বাচিত হয়নি। সব মিলিয়ে প্রতিটি খণ্ড থেকে নয়টি করে মোট সাতাশটি গল্প আমরা মলাটবদ্ধ করেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা গল্পের মূল নির্যাসটুকুই কেবল নিয়েছি। সাহিত্যের মূলানুগ ভাষান্তর হয় না। তাই আমরা ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছি। আবহ নির্মাণেও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করা হয়েছে। চরিত্রগুলোর নাম বাঙালি পাঠকদের রুচির দিকে খেয়াল রেখে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা হয়েছে। কোথাও গল্পের স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ন রাখতে ক্ষণিকের জন্য একটি নতুন চরিত্র জুড়ে দেয়া হয়েছে কিংবা মূল আবহের পরিসরটাকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শাইখের লেখার মূল গতিধারায় কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি। তাঁর গল্পের গতি-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে, 'স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে'। আশা করি এই গল্পগুলো পাঠক-বন্ধুদের আলোর ভুবনে নিয়ে যাবে। গল্পে গল্পে মনে করিয়ে দেবে আল্লাহর আনুগত্যের কথা—রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভালোবাসার কথা। অন্তরে জাগিয়ে তুলবে আখিরাতের অতুল স্বপ্ন—জান্নাতের অমিত সম্ভাবনা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তুচ্ছ দুনিয়ার অসারতা। গল্পের ভেতর বিচরণ করতে গিয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন, তার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে আল্লাহর ভয় আর আখিরাতের প্রস্তুতির দুর্নিবার বাসনা।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করুন। আমাদের মেহনতে পরিপূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। (আমিন)

- আমীমুল ইহসান
২৮-০১-২০১৯
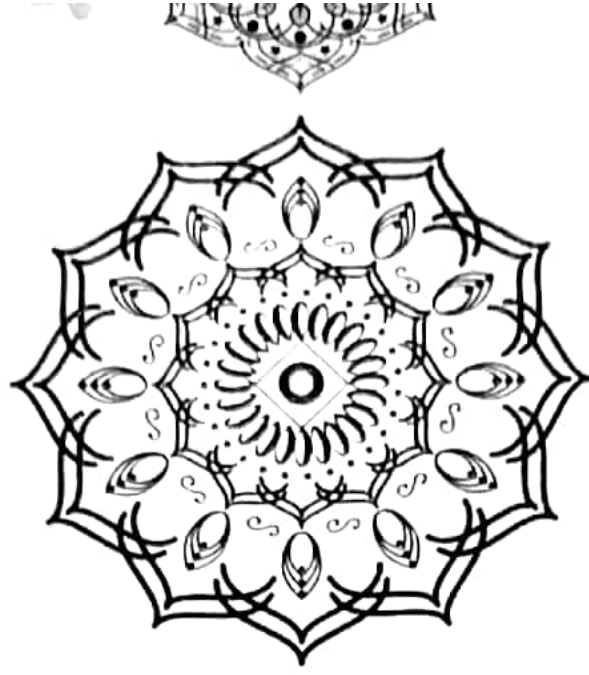
স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে

প্রথম খণ্ড

সূচিপত্র

ওপারের যাত্রী

বলো হে পৃথিবী!
কোথায় হারিয়ে গেল বন্ধুরা মোর
আসিবে কি তারা আর কখনো ফিরে?
হাজারো জনতার ভিড়ে আমায়
বিষণ্ন নির্জনতা তাড়া করে ফেরে।
জগতের হাটে কেনা-বেচা শেষে
দিয়েছে পাড়ি সবে জীবনের ওপারে
আপন সওদা হাতে।

বোনের চেহারাটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে আসছে ক্রমশ। ধীরে ধীরে যেন নেতিয়ে পড়ছে শরীরটাও। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো ভাবান্তর নেই। সে তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করে প্রতিদিন।

যখনই তার খোঁজ করো দেখবে, সে বসে আছে জায়নামাজ পেতে—কখনো ঝুঁকছে রুকুতে, কখনো লুটিয়ে পড়ছে সিজদায়, কখনো-বা হাত দুটি মেলে ধরছে রবের দরবারে। সুবহে সাদিকের ম্লান আলোতে, সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে কিংবা গভীর রজনীর সুষুপ্ত প্রহরে—সব সময় তোমার চোখে পড়বে এই একই দৃশ্য। ক্লান্তি বা বিরক্তির কোনো চিহ্নই তুমি দেখবে না তার অবয়বে। অফুরন্ত উদ্যমের এক অপার্থিব আলো যেন সারাক্ষণ ঘিরে রাখে তাকে।

অপরদিকে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের এক মেয়ে। বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন পড়তে ভালোবাসি। গল্প ও উপন্যাসের স্তূপ জমে ওঠে আমার টেবিলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই ইউটিউবে ভিডিও দেখে। বাড়ির কাজগুলো আদায় করা হয় না ঠিকমতো। এমনকি নিয়মিত সালাত আদায় করাও আমার হয়ে ওঠে না কোনো দিন।

বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম ও মুভির প্রতি আমি চরম আসক্ত। টানা তিন ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে একেকটি মুভি দেখি। ওদিকে মসজিদের মিনার হতে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি—এতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না আমার অন্তরে। আমি ব্যস্ত থাকি আমার কাজে।

দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেটে কাটিয়ে সেদিন যখন বিছানায় যাই, রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। জায়নামাজে বসে অনুচ্চ স্বরে সে আমাকে ডাকে—

- হেনা! এ্যাই হেনা!!
- কী বলতে চাও বলো, নাওরা। (আমার কণ্ঠে বিরক্তির আভাস)
- দেখো, ফজরের সালাত না পড়ে ঘুমোবে না কিন্তু। (তার গলার স্বর বেশ উঁচু ও ধারালো শোনায়)
- উফ! কী যে বলো। এখনো কয়েক ঘণ্টা বাকি।

আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিই—কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। আমার চোখ খোলে যথারীতি ভোরের আলোতে।

দিন যায়, সপ্তাহ ফুরোয়—মাস আসে। কোনো পরিবর্তন নেই আমাদের জীবনে। স্বাতন্ত্র্যের কোনো চূড়া জেগে ওঠে না চলমান সময়ের নিস্তরঙ্গ সমতলে।

তার শরীরে বাসা বাঁধা মারাত্মক ব্যাধিটি ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। একসময় শয্যাশয়ী হয়ে পড়ে সে। একদিন আমাকে ডাকে :

- হেনা! একটু এদিকে আসবি? আমার পাশে খানিকক্ষণ বসবি? (তার মধুর স্বরে অদ্ভুত এক আকর্ষণ—যা উপেক্ষা করার শক্তি আমার কোনো

কালেই হয়নি। সদা সত্যভাষী আর নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণেই হয়তো—তার কথায় ফুটে ওঠে অদম্য এক ব্যক্তিত্ব, যার প্রভাব এড়ানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।)

- কিছু বলবে?
- বসো। কিছুক্ষণ আমার পাশে বসো।
- বসলাম। এবার বলো, কী বলতে চাও? (আমার চোখে-মুখে কৌতূহলের ঝিলিক)
- ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ 'জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে।'[১]

তার সুমিষ্ট মোলায়েম সুরের তিলাওয়াতে আমি অভিভূত হই। আয়াতটি পড়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। চেহারায় তার প্রশান্তির দীপ্তি। তারপর ধীর কণ্ঠে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে :

- তুমি কি মৃত্যুতে বিশ্বাস করো না?
- অবশ্যই বিশ্বাস করি। (আমার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা)
- ছোট-বড় সকল কথা ও কর্মের হিসেব দিতে হবে—তা কি বিশ্বাস করো না?
- অবশ্যই! কিন্তু...কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো অসীম দয়ালু—পরম ক্ষমাশীল। আর পুরো জীবনটাই তো পড়ে আছে সামনে।
- তুমি কি জানো না, মৃত্যু যেকোনো মুহূর্তে কড়া নাড়তে পারে তোমার দরোজায়? মারইয়ামের কথা মনে নেই—কিছুদিন আগে যে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে? তোমার বান্ধবী সাওদার ব্যাপারে কী বলবে তাহলে? আর জাহরা তো তোমারই সহপাঠী ছিল, তাই না? আজ কোথায় ওরা? মৃত্যু বয়স চেনে না—মানে না কোনো সমীকরণ।

---

১. সুরা আলি-ইমরান, ৩ : ১৮৫।

- তুমি জানো আমি অন্ধকারে ভয় পাই। এভাবে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ কেন আমাকে? এখন আমি রাতে ঘুমাব কীভাবে? আমি তো ভেবেছিলাম, এবার তুমি আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে যেতে রাজি হয়েছ—আর তা-ই বলার জন্য ডেকেছ আমাকে। (ভীত কম্পিত শোনায় আমার গলা।)

সহসা তার কণ্ঠে যেন ঝরে পড়ে একরাশ বিষণ্ণতা। সম্মুখে প্রসারিত তার স্থির দৃষ্টি। স্বগতোক্তির মতো করে সে বলে :

- খুব সম্ভব এই বছর আমি খুব দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি—অন্য একটা জায়গায়। জীবনের ওপারের দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসছে বারবার। হায়াত তো আল্লাহরই হাতে।

বলতে বলতে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তার মায়াবী চোখদুটি। সৌম্য মুখাবয়বে তার জেগে ওঠে দূর আকাশের স্বপ্ন। মনে হয় সে আমার পাশে নেই, উড়ে বেড়াচ্ছে দূরের কোনো দিগন্তে—যেখানে আসমান চারদিক থেকে গোল হয়ে নেমে মাটি ছুঁয়েছে।

সহসা মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা। ডাক্তাররা আব্বুকে একান্তে ডেকে বলেছেন—'এই রোগ মানুষকে বেশি দিন বাঁচতে দেয় না।' কিন্তু ওকে তো কেউ এই খবর জানতে দেয়নি। তাহলে...? আমার মনে হয়, এভাবে হারিয়ে যাওয়াই তার জীবন-স্বপ্ন। হঠাৎ তার দৃঢ় কণ্ঠে আমি ফিরে আসি ভাবনার জগৎ থেকে...

- কী হলো তোমার? এভাবে কী চিন্তা করছ? তুমি কি তাহলে ভাবছ—আমি অসুস্থ বলেই এমন কথা বলছি?

- কক্ষনো না! বরং দেখা যায়, বহু সুস্থ মানুষ চলে যায় অসুস্থেরও অনেক আগে।

- তোমার বয়স এখন বিশ বছর। তুমি আর কয় বছর বাঁচবে?—ধরো আরও বিশ বছর অথবা মনে করো চল্লিশ বছর। তারপর কী হবে?

বলতে বলতে ডান হাত খানিকটা উঁচুতে তুলে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে সে। সহসা মনে হয়, তার হাতটি আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। সম্মোহিতের মতো তার দিকে ঠায় চেয়ে থাকি। মৌনতা ভেঙে সে আবার বলে :

- কোনো পার্থক্য নেই আমাদের মাঝে—সবাই চলে যাব আমরা মায়াভরা এই জগৎ ছেড়ে। হয় জান্নাত, নয় জাহান্নামই হবে আমাদের ঠিকানা। তুমি আল্লাহর সেই বাণীটি শোনোনি?—﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ 'যাকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম।'[২]

আবারও কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থাকে সে। কী যেন গুছিয়ে নেয় মনে মনে। ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে তার বুদ্ধিদীপ্ত মায়াবী চোখদুটি। আবার সচল হয়ে ওঠে তার নিশ্চল ঠোঁট। আমার ডান হাতটি নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলে :

- সকালে নতুন খবর শুনবি।

- আচ্ছা। আমার একটু তাড়া আছে। পরে কথা হবে। (এই বলে আমি উঠে পড়ি তার শিয়র থেকে)

যেতে যেতে আমার কানে গুঞ্জন তুলে তার শেষ কথাগুলো : 'বোন আমার! আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন। সালাতের কথা ভুলে যেয়ো না।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ঠক ঠক ঠক। দরোজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে হঠাৎ ঘুম ছুটে যায়। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাই দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে। কী হলো আজ? এখনো তো মোটে আটটা! আমার জাগার সময় তো হয়নি। সহসা কানে ভেসে আসে অনেকগুলো মেয়েলি কান্নার আওয়াজ। সেই সঙ্গে বহু মানুষের শোরগোল। বুকটা ধক করে ওঠে। ইয়া আল্লাহ! কী হচ্ছে এসব...। দরোজায় আর শব্দ হচ্ছে না।

---

২. সুরা আলি-ইমরান, ৩ : ১৮৫।

আমি দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠি। দরোজার দিকে যেতে যেতে মনে পড়ে যায় নাওরার কথা। তাকে নিয়ে আব্বু হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...

বাসার সবাই বিষণ্ন। আম্মু ও ফুফুরা অনুচ্চ স্বরে কাঁদছেন। ছোট ভাইটা ব্যালকনির রেলিং ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ বেদনায় কেমন যেন হুহু করে ওঠে মনটা।

এই বছর বোধহয় আর কোনো ভ্রমণ হবে না। পুরো সময়টা ঘরেই কাটাতে হবে। আহা! কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি...

জোহর একটার সময় হাসপাতাল থেকে আব্বুর ফোন আসে। তিনি বলেন—'এখন নাওরার সঙ্গে দেখা করা যাবে। তাড়াতাড়ি এসো...।' ফোন রেখে আম্মু কাঁদতে কাঁদতে জানান, 'তোর আব্বুর কথা শুনে মনে হচ্ছে, নাওরার অবস্থা বড় ভালো না। তার কণ্ঠ কেমন ভেজা ভেজা আড়ষ্ট মনে হয়েছে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হয় সবাই। ড্রাইভারকে ডাকতে ডাকতে গাড়ি-বারান্দায় চলে আসি। দ্রুত গাড়ি বের করে সে। একের পর এক মোড় ঘুরে গাড়ি ছুটে চলে হাসপাতাল অভিমুখে। পরিচিত রাস্তাঘাট আর লোকজনের ভিড়ের মতো স্বাভাবিক দৃশ্যগুলোও চোখে ঝাপসা হয়ে ভাসে। প্রতিদিনের চলার পথটিকেও কেমন যেন বিদঘুটে মনে হয়। পাশে আম্মু অনুচ্চ স্বরে দোয়া করছেন নাওরার জন্য। মাঝে মাঝে বলছেন, 'আহা! আমার কলিজার টুকরো নাওরা! কত ভালো মেয়ে! কত ভালোবাসত আমায়! কোনো দিন সময় নষ্ট করতে তাকে দেখিনি...।'

পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে বিশাল গেইট পেরিয়ে ধীর পায়ে প্রবেশ করি হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে। বিকট শব্দে সাইরেন বাজিয়ে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স এসে থামে আমাদের থেকে একটু দূরে। কর্তব্যরত কর্মচারীরা ছুটে আসে গাড়ির চারপাশে। একটি রোগী ওহ ওহ করে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আরেকজনের শরীর রক্তাক্ত—ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। তৃতীয়জনের চোখদুটি নষ্ট হয়ে গেছে—কে জানে বেচারা বেঁচে আছে কি না। লোকেরা বলাবলি করছে, কোথাও নাকি গাড়ি উল্টে খাদে পড়েছে।

মানুষের ভিড় ঠেলে করিডোর ধরে সামনে খানিকটা গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দুতলায় চলে আসি আমরা। চারদিকে অদ্ভুত সব দৃশ্য—যা আগে কখনো দেখা হয়নি। হঠাৎ আব্বুকে আসতে দেখি। আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেন তিনি। তাড়া দিয়ে বলেন, 'চলো। আমার সাথে এসো। ও এখন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।' আব্বুকে অনুসরণ করে আমরা 'আইসিইউ'-এর মূল দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। পরিচিত এক নার্স এসে আম্মুকে বলে, 'আপনার মেয়ে অনেক ভালো আছে।' তার কথা শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আম্মুর মুখ।

ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে একসঙ্গে একজনের বেশি প্রবেশের অনুমতি নেই। প্রথমে যান আম্মু। একটু পরেই তিনি বেরিয়ে আসেন—দুচোখে তাঁর অশ্রুর বন্যা। মেয়ের সামনে কান্না লুকোতেই বোধ হয় চলে এসেছেন দ্রুত। এবার আমার পালা। ধীর পায়ে দরোজা ঠেলে ভেতরে যাই। রোগী দেখার ব্যবস্থা দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি দিয়ে দূর থেকে দেখতে হয়—কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই। সাদা পোশাকের ডাক্তারদের ভিড়ের মাঝে নাওরা নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পর আব্বুর প্রচেষ্টায় ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে যাই। দায়িত্বশীলরা আমাকে বলে দেয়, 'দুই মিনিটের বেশি থাকা যাবে না।'

ত্রস্তপদে আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। কাছে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলি :

- কেমন আছ নাওরা? গত সন্ধ্যায়ও তো তুমি ভালো ছিলে। হঠাৎ কী হলো তোমার? (বলতে বলতে আমি তার পাশে গিয়ে বসি।)

- আলহামদুলিল্লাহ! আমি এখন ভালো আছি। (আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে) কিন্তু তোমার হাত দেখছি ভীষণ ঠান্ডা!

খাটিয়ার এক প্রান্তে বসে আমি দু'হাতে তার পা স্পর্শ করি। সে খুব দ্রুত পা গুটিয়ে বলে :

- ইস! দেখ তো কারবার! আমি তোমাকে ভালোভাবে বসতেও দিইনি।

- আরে নাহ! আমি বসতে পেরেছি।

আমি ঠায় চেয়ে থাকি তার অপূর্ব মুখশ্রীর দিকে। ইস! কত সুন্দর আমার বোনটা। দেখে যেন আশ মেটে না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার মুখ খুলে সে :

- জানো, আমি এই আয়াতটি নিয়ে ভাবছি : (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) 'পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।'[৩] হেনা! আমার জন্য তুমি অবশ্যই দোয়া করবে। খুব দ্রুত আমি আখিরাতের প্রথম দিনটিকে স্বাগত জানাতে চলেছি। আমার সফর বড়ই দীর্ঘ—সে তুলনায় পাথেয় বড়ই অল্প।

তার এমন হৃদয়-বিদারক কথা শুনে বুকটা ধক করে ওঠে। অশ্রুরা এসে ভিড় করে দুচোখের কোনায়। সহসা আমার শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় এক শীতল স্রোত। সেই সঙ্গে থরথর করে কেঁপে ওঠে পুরো শরীর। উচ্ছ্বাসিত ভাবাবেগ রোধ করতে দু'হাতে মুখ ঢেকে আমি দ্রুত বেরিয়ে আসি ইউনিট থেকে। আমার অবস্থা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যান আব্বু। বাড়িতে কেউ আমাকে এভাবে কাঁদতে কিংবা ভেঙে পড়তে দেখেনি কোনো দিন।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ধীরে ধীরে অস্তমিত হয় বিষণ্ন সেই দিনটির রক্তিম সূর্য। সাঁঝের ঘনায়মান আঁধারের সাথে সাথে অদ্ভুত এক মৌনতা এসে গ্রাস করে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়িটা। সময় যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অপরিচিত লাগে চারপাশের সবকিছু।

ঘোর কাটতেই বুঝতে পারি, জনসমাগমে পুরো বাড়িটা গমগম করছে। আমার চাচাতো বোনরা এসেছে। খালাতো বোনদেরও দেখতে পাই। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রই। এত মানুষ কেন আজ? আমার বুঝতে বাকি থাকে না—নাওরা আর নেই। চলে গেছে সে... বহু দূরে... না ফেরার দেশে...

---

৩. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২৯-৩০।

জানি না, এরপর কী ঘটে আমাদের বাড়িতে। কারা এসেছে? কে কী বলছে?—সবকিছু কেমন ধোঁয়াশা হয়ে ওঠে আমার চোখে। হে আল্লাহ! কোথায় আমি—কী হচ্ছে এসব! পাথরের মতো জমে ওঠে আমার বুক। কান্নার শক্তিও আমি হারিয়ে ফেলি সেদিন।

পরে ওরা আমাকে বলে, 'আব্বু নাকি আমার হাত ধরে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন নাওরাকে। আর শেষ মুহূর্তে আমি চুমু খেয়েছি নাওরার হাতে।'

সহসা আমার মনে আবছা ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটি ছোট্ট দৃশ্য—'আইসিইউ'-তে নাওরা মোলায়েম কণ্ঠে তিলাওয়াত করছে : (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) এবারই প্রথম আমি উপলব্ধি করতে পারি : (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) আয়াতটির প্রকৃত মর্ম।

সেদিন রাতেই আমি গিয়ে বসি নাওরার সেই জায়নামাজে। মনটা হুহু করে কেঁদে ওঠে অজানা এক আবেগে। নাওরা আমার বোন। একসঙ্গে ভাগাভাগি করে ছিলাম একই মায়ের উদরে। একসাথে বেড়ে উঠেছি আমরা। আমরা জমজ বোন। নাওরা আমার জীবনসাথি—আমার সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী।

ফেলে আসা দিনগুলোর কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। কী সুন্দর দিন ছিল আমাদের। নাওরা আমাকে খুব ভালোবাসত—তার প্রাণের চেয়েও বেশি। আমার হিদায়াতের জন্য নিরন্তর দোয়া করে যেত। গভীর রাতে রবের দরবারে হাত তুলে অশ্রু ঝরাত। আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত মৃত্যুর কথা, আখিরাতের কথা—হাশরের কথা।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আজ কবরে নাওরার প্রথম রাত। হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহম করো। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও—উদ্ভাসিত করো তোমার করুণার আলোয়।

জায়নামাজে বসে আমি চারদিকে তাকাই। ওই তো নাওরার কুরআন শরিফ—সযতনে রাখা আছে শেল্ফে। আর ওই যে তার জামা-কাপড়—দেয়ালে ঝুলছে। ওখানে কাঁচের শোকেজে ভাঁজ করা তার গোলাপি কামিজটিও দেখা যাচ্ছে—সে বলত, 'এটি বিয়ের জন্য তুলে রেখেছি।'

দেখতে দেখতে হৃদয়ে জেগে ওঠে বিরহের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। চোখের শুকিয়ে যাওয়া ধারাগুলো সজীব হয়ে ওঠে আবার। সহসা মনে হয়, বাড়িটা কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে ঘরের অলিন্দে, বাড়ির ছাদে—পশ্চিমের ব্যালকনিতে।

মনের অজান্তেই আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি হৃদয়ে বড় করুণ হয়ে বাজতে থাকে। নাওরা..! নাওরা..!! বোন আমার!!! কোথায় তুমি। কেন এভাবে একা ফেলে চলে গেলে? অশ্রুভেজা হাতদুটো আসমানের দিকে মেলে ধরে বলি, 'আল্লাহ, মালিক আমার! অনেক নাফরমানি করেছি। আমি তাওবা করছি। আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না। প্রভু আমার! আমার বোনকে কবরে তুমি শান্তিতে রাখো।'

আচমকা মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে অদ্ভুত এক ভাবনা—আজ যদি নাওরার জায়গায় আমি হতাম। কী হতো আমার পরিণতি?! আমি আর ভাবতে পারি না। অজানা এক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে আমার অন্তরাত্মা।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!!

মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আজানের সুমধুর সুর—অদ্ভুত এক ঝংকার তোলে হৃদয়তন্ত্রীতে। সম্মোহিতের মতো আমিও বলতে থাকি মুআজ্জিনের সাথে সাথে—'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!!' অন্তরের কোথাও যেন দোলা দিয়ে যায় অনাবিল প্রশান্তির হিমেল হাওয়া। শাদা ওড়নাটি গায়ে জড়িয়ে আমি জায়নামাজে দাঁড়াই। মনে হয় জীবনের শেষ সালাত আদায় করছি—যেমনটি করেছিল নাওরা। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

তারপর..? তারপর সময়ের স্রোত বয়ে চলে—কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে। আমি আর সেই আগের হেনা নেই—আগের মতো আর বলি না, 'পুরো জীবনটাই তো সামনে পড়ে আছে!'

ভোরে উঠে আমি আর বিকেলের আশা করি না।

সন্ধ্যায় ঘনায়মান আঁধার দেখে প্রতীক্ষা করি না নতুন সূর্যোদয়ের।

গাফিলতি

“

একদা হাসান বসরি ﷺ একটি জানাজার পেছনে পেছনে গোরস্তানে যান। কবরের পাড়ে বসে তিনি বলেন, ‘পার্থিব জীবনে দুনিয়াবিমুখ হওয়া চাই আর ভীত হওয়া চাই আখিরাতের ব্যাপারে।’

‘**হে** *আমাদের রব!*

যখন কান্নার রোল উঠবে আমাদের ঘিরে। শাদা কাফনে ঢেকে দেয়া হবে নিথর দেহ। খাটিয়া কাঁধে বিরান গোরস্তানে রওনা হবে আপনজনরা। কবরের নিকষ কালো আঁধার যখন গ্রাস করবে আমাদের। হে আল্লাহ! তখন তুমি আমাদের সাথি হয়ে থেকো। তোমার রহমত দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখো।

হে আল্লাহ!

আমাদের রহম করো—যখন আমাদের জরাজীর্ণ কবরগুলো মিশে যাবে মাটিতে। মানুষ ভুলে যাবে আমাদের কথা—আমরাও ছিলাম একদিন এই পৃথিবীর বাসিন্দা। কারও মুখে আর উচ্চারিত হবে না আমাদের নাম। কবরের পাড়ে এসে দাঁড়াবে না কেউ হাত তুলে।’

হঠাৎ লাল আলো জ্বলে ওঠে সিডি প্লেয়ারের এক কোনায়। টুক করে মিষ্টি একটি শব্দ হয়। সেই সাথে থেমে যায় শাইখের আওয়াজ। তার মানে ক্যাসেট শেষ!—কিন্তু কানে বাজতে থাকে দোয়ার মর্মস্পর্শী শব্দমালা। আচমকা যেন সম্বিত ফিরে পাই। রিমোর্ট টিপে রিওয়াইন্ড করি দশ মিনিট। আবার ভেসে আসে শাইখের বিনয়-বিগলিত কণ্ঠস্বর...

'যখন কান্নার রোল উঠবে আমাদের ঘিরে। শাদা কাফনে ঢেকে দেয়া হবে নিথর দেহ। খাটিয়া কাঁধে বিরান গোরস্তানে রওনা হবে আপনজনরা...'

অন্তরে কোথাও যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। তিরতির করে কাঁপতে থাকে বুকটা। সম্মোহিতের মতো আমিও বলতে থাকি শাইখের সঙ্গে : 'হে আল্লাহ! আমাদের রহম করুন—যখন আমাদের জরাজীর্ণ কবরগুলো মিশে যাবে মাটিতে...।'

ইস! খুব দ্রুত ঘুরছে অডিও সিডিটা!! আবার শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় বারের মতো রিওয়াইন্ড করি—বিশ মিনিট পেছনে গিয়ে। কক্ষজুড়ে ঝংকার তোলে শাইখের আবেগ-মথিত স্বর। ড্রয়িং রুমের জানালা গলিয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে যায় দৃষ্টিরা। সহসা মনে হয়, নীল আকাশ যেন বিরাট এক রুপোলি পর্দা। ক্ষণে ক্ষণে হাজারো ছবি তাতে ভেসে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্লেয়ার কবে বন্ধ হয়েছে কে জানে। অদ্ভুত সব ভাবনায় ছেয়ে আছে মন। বিকেলটা বড় সুন্দর হয়ে এসেছে। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসি। শরীরের সবটুকু ভার ছেড়ে হেলান দিই। এক অজানা আবেশে শিরশির করে ওঠে ভেতরটা। চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসে আপনাতেই। হৃদয়ের গভীরে জেগে ওঠে কয়েকটি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা—কী লুকিয়ে আছে রহস্যময় এই জীবনের ওপারে? কী অপেক্ষা করছে আমার জন্য কবরের নিকষ কালো আঁধারে?

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আমার বোন মাইমুনা। বড়ই আদরের। সর্বক্ষণ ভাবে আমাকে নিয়ে। সে চায়, আমি যেন সালাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি—বাউন্ডুলে জীবন ছেড়ে ফিরে আসি আল্লাহর পথে। কত চিন্তাই না করে সে। কখনো হাত ধরে বোঝানোর চেষ্টা করে। কখনো টেবিলে রেখে দেয় সুন্দর কোনো বই। তবে আমি ভীষণ গাফিল। ওসব বই খুলে দেখার ইচ্ছে আমার কখনো হয়নি।

সেদিন ছিল বুধবার। মাইমুনার মাদরাসায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চলছে। জোহরের পর আমি গাড়ি নিয়ে তাকে মাদরাসা থেকে আনতে যাই। কৃতী শিক্ষার্থী হিসেবে বেশ কয়েকটি পুরস্কার পায় সে। খুশিতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল। বাসায় এসে কখন আব্বু-আম্মুর সামনে পুরস্কারগুলো খুলবে—আর যেন তর সয় না। উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। গাড়িতে উঠেই বলে :

- 'ভাইয়া! তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে!

- কী সারপ্রাইজ বলে ফেল দেখি।

- নাহ! এখন বলা যাবে না। পরে তুমি নিজেই দেখবে।

তার আনন্দ দেখে আমার মনটাও খুশি হয়ে ওঠে। বাসায় পৌঁছে বোরকা না খুলেই সে বিশাল হইচই বাঁধিয়ে দেয়।

সেদিন বিকেলে বাইরে থেকে এসে যথারীতি সিডি প্লেয়ারটা অন করি—শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ গান শুনব বলে। গতকাল নতুন কেনা ক্যাসেটটা পুরোটা শোনা হয়নি। দারুণ হিট হয়েছে কয়েকটা গান। রিমোর্ট টিপতেই চমকে উঠি। আমাকে অবাক করে দিয়ে গমগম করে ওঠে জনৈক শাইখের মর্মস্পর্শী আহ্বান—

'হে আমাদের রব!

যখন কান্নার রোল উঠবে আমাদের ঘিরে। শাদা কাফনে ঢেকে দেয়া হবে নিথর দেহ। খাটিয়া কাঁধে বিরান গোরস্তানে রওনা হবে আপনজনরা। কবরের নিকষ কালো আঁধার যখন গ্রাস করবে আমাদের ...।'

বুঝতে আর বাকি থাকে না—এটি মাইমুনার কাজ। তার পাওয়া পুরস্কারের মধ্যে নিশ্চয় এই অডিও সিডিটাও ছিল। কত নিখুঁতভাবে সে আমার প্লেয়ারের আধশোনা ক্যাসেট বদলে দিল।

মাগরিবের পরে ক্যাসেটটা শুরু থেকে শুনি। ইশার পর আবার। পরদিন সকালে পুনরায় বসি। শাইখের হৃদয়-বিদারক আহ্বান অন্তরকে দুমড়ে

মুচড়ে একাকার করে ফেলে। অবচেতন মনে বারবার জেগে ওঠে একই জিজ্ঞাসা—ইয়া আল্লাহ! কোন পথে চলেছি আমি? এই পথ তো ধ্বংসের। এই পথ লাঞ্ছনার। এই পথ হতভাগাদের।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সকালে নাস্তা করার সময় খেয়াল করি, মাইমুনা বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। তার চোখে-মুখে কৌতূহল। আমি হেসে বলি :

- কী? কিছু বলবি?

- তুমি দেখছি, আজকে ফজরের সালাত পড়েছ!

আমি মুচকি হেসে মাথা নিচু করি। একটু থেমে বলি :

- শাইখের নামটা কী?

- বলব। আগে বলো, তোমার ভালো লেগেছে?

- হুম! অনেক ভালো লেগেছে।

আমার চোখে আগ্রহ দেখে ভীষণ খুশি হয় মাইমুনা। সেদিন খেতে খেতে অনেক কথা হয় তার সাথে। ভাই-বোনের আড্ডা দেখে আব্বু দূর থেকে মুখ টিপে হাসেন। কথা প্রসঙ্গে মাইমুনা বলে :

- ভাইয়া! শাইখের একটি চমৎকার বইও আমি পেয়েছি অডিও সিডিটার সাথে। সেটি তোমাকে পড়তে হবে।

- দিস। পড়ব আমি।

- কই? আগের বইগুলো তো সব ফেলে রেখেছ?

- নাহ! এবার আর রাখব না। শাইখের বই অবশ্যই আমি পড়ব।

আমার খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। মাইমুনা দ্রুত উঠে তার শেল্ফ থেকে একটি বই নিয়ে আসে। বইটি কোলের ওপর রেখে আমাকে বলে, 'ভাইয়া! গতকাল রাতেই আমি এটি শেষ করে ফেলেছি। তুমি পড়ার আগে আমার মুখে এই বই থেকে একটি ঘটনা শোনো—

“একবার হাসান ﵁ জনৈক যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গোল করে বসে সে হাসি-ঠাট্টায় আসর বসিয়েছিল। হাসান ﵁ তাকে বললেন :

- হে যুবক, তুমি কি পুলসিরাত পার হয়ে গেছ?

- নাহ।

- তুমি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে—তা কি জানো?

- নাহ।

- তো এভাবে হাসছ কেন?

এর পর থেকে কখনো তাকে আর হাসতে দেখা যায়নি।”’

মাইমুনার বর্ণনাভঙ্গি আমাকে বেশ মুগ্ধ করে। গল্প শেষ হলেও উপলব্ধির রেশ কাটতে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থাকি আমরা দুজন। ততক্ষণে আমার খাওয়া শেষ হয়ে আসে। বইটি হাতে নিয়ে আমি চলে আসি আমার রুমে। চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে বইটি খুলি। ভেতরে প্রথম পৃষ্ঠায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—‘প্রিয় ভাইকে, মাইমুনা।’ তার নিচে জ্বলজ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটি প্রশ্ন—

‘ভাইয়া! আর কতকাল তুমি আল্লাহকে ভুলে থাকবে?’

আমার ঠোঁটে ফুটে ওঠে অর্থপূর্ণ এক হাসি। আনমনে বলি, ‘আর নয় পাগলি বোন আমার।’ অনেকটা স্বগতোক্তির মতো শোনায় আমার কণ্ঠ।

উপহার

“

আমর বিন কাইস ﷺ বলেন, ‘নতুন কোনো পুণ্যকর্মের কথা জানতে পারলে একবার হলেও আমল করো—যাতে তুমিও শামিল হতে পারো পুণ্যবানদের কাতারে।’

আশির দশকের শেষ দিকের কথা। দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি মেডিকেল কলেজ থেকে আমি ডিগ্রি নিয়ে বের হই। পড়াশোনায় আমি নিয়মিত ছিলাম না। তাই ফাইনাল পরীক্ষাগুলো দিতে আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়। তবে আল্লাহ সবকিছু সহজ করে দেন। আমি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হই। কর্মসংস্থানের জন্যও বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি আমাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চাকরি হয়ে যায় শহরের কাছেই একটি হাসপাতালে। আল্লাহর অশেষ রহমতে বেশ সহজ একটি পোস্টে আমি নিয়োগপ্রাপ্ত হই।

আমাদের বাসা শহরের একটি মনোরম জায়গায়। আব্বু-আম্মুর সঙ্গেই আমি থাকি। একমাত্র সন্তান বলে আমাকে নিয়ে তাদের স্বপ্নেরও কোনো শেষ নেই। চাকরির প্রথম বেতন পেয়েই আমি চলে যাই শপিং মলে। আব্বুর জন্য একটি দামি শাদা জুব্বা আর আম্মুর জন্য নীল কামিজ ও হিজাব নিয়ে বাসায় ফিরি। একমাত্র সন্তানের সামান্য উপহারে আব্বু-আম্মুর মুখে যেন ফুটে ওঠে ভুবনবিজয়ী হাসি। দুজনের সে কী আনন্দ! সে কী চাপা উল্লাস!! আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি।

আব্বুর পরামর্শে প্রতি মাসের বেতন থেকে বাঁচিয়ে আমি সঞ্চয় করতে শুরু করি। বিয়ে করব—মোহরানার জন্য বেশকিছু অর্থের প্রয়োজন। আম্মুও বারবার তাগিদ দিচ্ছেন এ ব্যাপারে। আব্বুও নাকি সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কর্মক্ষেত্রে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব বেশ আন্তরিকতা ও সময়নিষ্ঠার সঙ্গে আদায় করি। আমাদের হাসপাতালটি ছিল মূলত সামরিক। এখানে শৃঙ্খলা ও কর্তব্যনিষ্ঠার বেশ মূল্যায়ন হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ প্রশংসিত হয় আমার কর্মতৎপরতা। ফলে বছর না গড়াতেই আমার পদোন্নতি হয়। বিরক্তিকর থিউরেটিক্যাল পড়াশোনার চেয়ে প্রাক্টিক্যাল কাজকর্মই আমার ভালো লাগে।

হাসপাতালে অফিসার ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় বিভিন্ন দেশ ও ভাষার মানুষ। একই প্রতিষ্ঠানে কাজের সুবাদে তাদের সঙ্গে বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে আমার। স্থানীয় হিসেবে তারা আমাকে অন্য চোখে দেখে। আধুনিক আরবি উচ্চারণে তারা আমাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। কেননা, অনারব হওয়ার কারণে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় তাদের সমস্যা হয়। হাসপাতালের অদূরেই আব্বুর কৃষি খামার। কখনো কাজের ফাঁকে তাদের নিয়ে ঘুরতে যাই সেখানে।

ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের বন্ধন। কারও চাকরির মেয়াদ শেষ হলে বা পোস্টিং পরিবর্তন হলে আমরা সবাই মিলে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এটি হাসপাতালের অফিসার ও কর্মচারীদের একটি অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একবার মেয়াদ শেষে জনৈক ব্রিটিশ ডাক্তার দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের সাথেই কাজ করে সে। খুব মিশুক ও সরল প্রকৃতির মানুষ—সহজেই আপন করে নিয়েছিল সবাইকে। তার বিদায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা পরামর্শে বসি। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয়—অনুষ্ঠান হবে আমাদের কৃষি খামারে। সেখানে সবকিছুর ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া শহরের অদূরেই এমন খোলামেলা মনোরম পরিবেশ সবার পছন্দ হয়।

একটি বিষয় নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে যাই—ব্রিটিশ ডাক্তার সাহেবকে আমার পক্ষ থেকে কী দেয়া যায় বিদায় উপহার হিসেবে? সবাই তো কিছু না কিছু দেবে। বিশেষ করে, আমি দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে কাজ করেছি। এই হিসেবে আমার উপহারটা একটু আলাদা হওয়া চাই। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথায় চমৎকার একটি আইডিয়া আসে। ডাক্তার সাহেব আরবের প্রাচীন লোকশিল্পের প্রতি বেশ আগ্রহী। সুযোগ পেলেই তিনি সংগ্রহ করেন প্রাচীন আরব শিল্পকর্মের বিভিন্ন নিদর্শন। আব্বুর কাছে বেশ ভালো একটি কালেকশন আছে এসবের। আমার এক চাচার শখ ছিল এসব সংগ্রহের। অনেক বছর আগে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। তার বিষয়-সম্পদ সবকিছুর মালিক হন আমার আব্বু। পাথরের তৈরি কারুকার্য-খচিত পাত্র, ভেড়ার পশমে বোনা জামা, পুরাতন আমলের খঞ্জর ইত্যাদির মতো প্রাচীন যুগের নানা জিনিসপত্তর তিনি সযতনে সাজিয়ে রেখেছেন বাড়ির স্টোর রুমের একটি অংশে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি একটি চমৎকার শিল্পকর্ম বেছে নিই উপহার হিসেবে।

আব্বুর সঙ্গে উপহার বিষয়ে আলোচনা করতে দেখে আমার চাচাতো ভাই আহমাদ বলে, 'ভাইয়া! এই শিল্পকর্ম তো দিচ্ছ—সাথে বইজাতীয় কিছু দিলে ভালো হতো না? এই ধরো, ইসলাম সম্পর্কে প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থ?' তার কথাটি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না আমার কাছে। আমি বলি, 'দেখা যাক। সুযোগ হলে এ জাতীয় কিছু একটা যোগ করলাম।'

কয়েক দিন পর আম্মুর জন্য এক জিলদ কুরআন শরিফ কিনতে আমাকে বড় একটি লাইব্রেরিতে যেতে হয়। সঙ্গে আছে আহমাদ। বই উপহারের কথা সে আবার মনে করিয়ে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের পরিচিতিবিষয়ক একটি ইংরেজি বইয়ের ওপর আমার নজর পড়ে। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে দেখে আহমাদের দিকে বাড়িয়ে দিই। 'দেখ তো—এটি চলবে কি না?' আহমাদ হাতে নিয়েই পড়তে লেগে যায়। এদিকে আমি কুরআন কিনে সেদিনের পত্রিকায় নজর বুলাতে শুরু করি। আহমাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে শেল্ফে হেলান দিয়ে ডুবে গেছে বইয়ের ভেতর। আহমাদ এ্যাই আহমাদ বলে ডাক দিই আমি। 'ভাইয়া, দারুণ'—বই থেকে চোখ না সরিয়ে বলে সে। 'আচ্ছা, নিয়ে এসো। বইটির দাম একেবারে সস্তা।'

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে বিদায়ের দিন। আমরা সবাই সমবেত হই কৃষি খামারের মনোরম চত্বরে। সবাই প্রকাশ করে আপন আপন অনুভূতি। ডাক্তার সাহেব কথা বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান আবেগের আতিশয্যে। সবার মুখে বেদনার ছায়া। গুণী লোকটি বেশ জনপ্রিয় ছিল সবার মাঝে।

সবশেষে উপহার প্রদান পর্ব। আমি প্রাচীন আরবীয় তাঁতশিল্পের আদলে তৈরি সুন্দর একটি রুমালে বইটি জড়িয়ে তার হাতে তুলে দিই। আমার আসল উপহার ওই বড় রুমালটি। কিন্তু বইটি এমনভাবে র‍্যাপিং করা হয়েছে—দেখে মনে হয় সেটিই আসল উপহার।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সময় বয়ে যায় তার আপন গতিতে। সপ্তাহ যায়, মাস আসে—বছর গড়ায়। আব্বুর এক বন্ধুর মেয়েকে ঘরে তুলি। বছর না ফুরোতেই তার কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক শিশু। আম্মুর সর্বক্ষণের ব্যস্ততা নাতিকে নিয়ে। পুত্রবধূকে তিনি গড়ে নেন নিজের মেয়ের মতো করে।

একদিন ব্রিটেন থেকে একটি পত্র আসে আমার ঠিকানায়। খামের ওপর ইংরেজিতে প্রেরকের নামধাম লেখা। মনে কৌতূহল নিয়ে পড়তে শুরু করি। ইংরেজিতে লেখা বলে পুরোটা বুঝতে পারছি না। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে ধারণা পেতেও কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ মনে হয়, আরে! এ তো আমার সেই পুরাতন ডাক্তার বন্ধুর চিঠি। কিন্তু ওর নাম তো... নাহ মনে পড়ছে না। দ্রুত ড্রয়ার থেকে আমার ডায়েরিটি বের করি। সেখানে স্পষ্টাক্ষরে তার নাম লেখা আছে। কিন্তু খামের ওপরে প্রেরকের নাম 'আব্দুল্লাহ' কেন? এটি তো আমার নাম! আর ব্রিটিশ ডাক্তার সাহেবের নামই-বা আব্দুল্লাহ হতে যাবে কেন?

চিঠি বন্ধ করে আমি আবার ভাবতে বসি। আব্দুল্লাহ নামের কোনো বন্ধুর কথা আমার মনে পড়ে না। নিরুপায় হয়ে চিঠিটি আবার খুলি। আবার পড়তে শুরু করি। এবার মনে হয়, বেশ সহজ ইংরেজিতে লেখা। একটু এগুতেই আমি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি—

'প্রিয় ভাই, আব্দুল্লাহ!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর তা সম্ভব হয়েছে আপনারই অসিলায়। আপনার বন্ধুত্বের এই ঋণ আমি কখনো ভুলতে পারব না। জীবনভর আমি আপনার জন্য দোয়া করে যাব। মনে পড়ে সেই বইটির কথা—যেটি বিদায় বেলায় আপনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন? একদিন আমি সেই বইটি পড়তে বসি। কেন জানি, আমার বেশ ভালো লেগে যায়। ইসলাম সম্পর্কে আরও জানতে আমার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। বইটির মলাটে প্রকাশকের ঠিকানা পেয়ে যাই। দ্রুত আরও বই অর্ডার করে বসি। যথাসময়ে বই এসে পৌঁছায় আমার ঠিকানায়।

আলহামদুলিল্লাহ! বইগুলো পড়ে ইসলামের আলো প্রবেশ করে আমার হৃদয়ে। আমি কাছের একটি ইসলামি সেন্টারে যোগাযোগ করি। সেখানে সবার সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিই। সেই সঙ্গে আমার নাম 'জোয়ান ফার্ডিনান্ড' বদলে আপনার নাম রাখি। কারণ, আল্লাহর পরে আপনার অনুগ্রহই আমার ওপর বেশি। অতি শীঘ্রই আমি বাইতুল্লাহর জিয়ারতে আসছি ইন শা আল্লাহ। আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব ... ।'

সালামান্তে
আপনার ভাই আব্দুল্লাহ

চিঠি শেষ করেই আমি দ্রুত সেটি আবার খামে পুরে ফেলি। আবার বের করে পড়তে শুরু করি নতুন করে। আবেগে কম্পমান আমার ঠোঁট। বুকজুড়ে অজানা এক অনুভূতির আলো।

এবার যেন ইংরেজি অক্ষরগুলো কথা বলে ওঠে। শব্দের অর্থ পেরিয়ে মর্মে গিয়ে ঠেকে আমার তীক্ষ্ণ মনোযোগ। চিঠি শেষ করেই তার ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ি আমি। হাজারো ভাবনা এসে ভিড় করে মনের অলিন্দে—আল্লাহ কীভাবে আমার অসিলায় একজন মানুষকে ইসলামের আলো দিলেন! অথচ আমি তার ব্যাপারে কত অবহেলাই না করেছি। ইস! ছোট্ট একটি বই—যার দাম মাত্র পাঁচ রিয়াল। এই দিয়ে আল্লাহ কীভাবে মানুষকে হিদায়াত দেন! সুখ ও দুঃখের মিশ্র অনুভূতি ঢেউ খেলে যায় হৃদয়ে।

আমার হাতে একজন মানুষ মুসলমান হয়েছে বলে খুশি হই—আবার দুঃখ পাই এই ভেবে যে, চাইলে কত সহকর্মী ডাক্তার, কত অফিসারকে আমি ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম!

আহ! আখিরাতের কত মূল্যবান পুঁজি সংগ্রহ করার সুযোগ আমি হারিয়েছি। কত কথা বলেছি, কত আনন্দ করেছি তাদের সাথে। একটি বারের জন্য হলেও কেন তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিইনি।

একটি মাত্র বই হিদায়াতের কারণ হলো এক আব্দুল্লাহর—আর আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলল আরেক আব্দুল্লাহর অন্তরে। সেদিন আমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করি, কোনো নেক কাজকেই আমি তুচ্ছ মনে করব না—যদিও তা এক রিয়াল মূল্যের কিতাব উপহার হোক।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কয়েক বছর পরের কথা। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত একটি আরবি জার্নাল আসে আমার হাতে। আফ্রিকায় খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা প্রসঙ্গে একটি লেখা পাই সেখানে। প্রবন্ধটির শেষের দিকে তুলে ধরা কয়েকটি তথ্যে আটকে যায় আমার সন্ধানী দৃষ্টি—

- আফ্রিকায় গির্জা নির্মাণের জন্য ১৩০ মিলিয়ন ডলার ফান্ড সংগ্রহ।
- চলতি বছর ৩৯,৬৮,২০০ জন খ্রিষ্টান পাদরি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।
- ১১,২৫,৬৪,৪০০ কপি ইনজিল বিতরণ করা হয়েছে।
- খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে ১,৬২০ টি রেডিও ও টিভি চ্যানেল চালু করা হয়েছে।

তথ্যগুলো ১৯৮৭ সালে আমেরিকা থেকে খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিসার্চ জার্নাল থেকে নেয়া।

আফসোস! খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারে গোটা বিশ্বে কাজ করছে কত হাজার মানুষ। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে আমাদের তৎপরতা কই?

সময়ের হিফাজত

“

হাসান বসরি ﷺ বলেন, ‘আমি এমন এক জাতি দেখেছি, যাদের কাছে সময়ের মূল্য ছিল অর্থের চেয়েও বেশি।’

গতকাল সন্ধ্যা থেকে আমার ছোট ছেলেটির অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না। কেমন যেন অসুস্থ ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়। আজ বিকেলে অফিস থেকে ফিরেই তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাব বলে ঠিক করি। সারাদিনের খাটুনি শেষে শরীরটা ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে। একটু বিশ্রাম নিতে মন চায়। কিন্তু আদরের ছেলেটির ভালোবাসার কাছে হার মানে সবকিছু। সন্তানদের প্রতি কী অদ্ভুত এক মায়া আকুলি-বিকুলি করে বাবাদের হৃদয়ে!

ছেলেকে ভালো করে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে করে নিয়ে যাই কাছের একটি হাসপাতালে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে অপেক্ষমাণ রোগীদের দীর্ঘ সারি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সবাই। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। ভাবগম্ভীর পরিবেশ। কিছু লোক এক ধরনের লাল কার্ড সংগ্রহ করেছে। তাদের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। সরাসরি ঢুকে যাচ্ছে তারা।

আমি আনমনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের দিকে তাকাই। চোখ বুজে আছে কিছু লোক—কে জানে, কী ভাবছে তারা? কিছু লোক আবার অস্থির চিত্তে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বিরক্তির বলিরেখা ফুটে উঠেছে কারও কপালে।

দরোজাটা ঈষৎ ফাঁক করে কিছুক্ষণ পরপর ডাক্তারের সহকারী লাইনে উঁকি মেরে সিরিয়াল শোনায়—আশি, একাশি, বিরাশি...। ক্ষণিকের জন্য সরব ও চঞ্চল হয়ে ওঠে এতক্ষণের মৌন পরিবেশ। যার সিরিয়াল পড়ে তার মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তির হাসি। দ্রুত পা চালিয়ে চেম্বারে ঢুকে পড়ে সে। তারপর আবার সেই অখণ্ড নীরবতা।

সহসা সুঠাম দেহের এক যুবকের ওপর গিয়ে আটকে যায় আমার দৃষ্টি। হাতে ছোট্ট একটি কুরআন শরিফ। নিবিষ্ট মনে তিলাওয়াত করছে সে। আশেপাশে কী হচ্ছে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। চেহারায় খেলা করছে প্রশান্তির দীপ্তি—চিন্তা বা পেরেশানির লেশমাত্র নেই সেখানে। আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিই—অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার চঞ্চল চাহনি বারবার তার ওপর গিয়ে থেমে যায়। লাইনে দাঁড়িয়ে আমি তার সুন্দর এই আমলটি নিয়ে ভাবি। সময়ের হিফাজতের প্রতি তার মনোযোগ আমাকে মুগ্ধ করে।

আমি ভাবতে থাকি। লাইনে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে যায়। এই লম্বা সময়ে তো আমার কিছুই করা হয়নি—কেবল বিরক্তিকর অপেক্ষা ছাড়া।

হঠাৎ হাসপাতালের মসজিদ থেকে ভেসে আসে মাগরিবের আজান। আমরা সালাত আদায় করতে চলে যাই। মসজিদে আমি যুবকটির কাছাকাছি দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। সালাত শেষে ফেরার পথে কথা বলি তার সঙ্গে। অনেক্ষণ আলোচনা হয় আমাদের। সে আমাকে জানায়, কয়েক বছর আগে তার কাছের এক বন্ধু সময় হিফাজতের জন্য তাকে এই সুন্দর উপায়টি বলেছিল। তখন থেকে সে আমল শুরু করে। ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে বাসায় ও মসজিদে তিলাওয়াতের জন্য যে সময় পাওয়া যায়, তার কয়েক গুণ বেশি সময় আমরা হারিয়ে ফেলি রাস্তায় কি বাসস্ট্যান্ডে—এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কিংবা কারও জন্য অপেক্ষা করে। তা ছাড়া নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতই সর্বশ্রেষ্ঠ। অপরিমিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি অর্থহীন চিন্তা ও অপেক্ষার পেরেশানি থেকেও মুক্তি দেয় কালামুল্লাহর তিলাওয়াত। একপর্যায়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা সময়ও বের

করতে পারেন?' আমি চিন্তায় পড়ে যাই। ইস! কত সময় আমি নষ্ট করেছি হেলায় ফেলায়। একবারও তো নেয়া হয়নি জীবনের হিসাব।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আফসোসগুলো ঘনীভূত হয়ে ওঠে ক্রমশ। আহা! মাসের পর মাস চলে যায়—আমার একটি বারের জন্যও বসা হয় না কুরআন নিয়ে। নতুন করে জীবনের হিসেব মেলাতে শুরু করি। দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে হায়াত। কীসের অপেক্ষায় আছি আমি?

হঠাৎ ডাক্তারের সহকারীর ডাকে ছেদ পড়ে ভাবনায়। এসে যায় আমার সিরিয়াল। হাসপাতাল থেকে আমি সোজা রওনা হই লাইব্রেরির দিকে। ছোট্ট পকেট সাইজের একটি কুরআন কিনি। সিদ্ধান্ত নিই সময়ের সদ্ব্যবহারের। হঠাৎ অন্তরে উদয় হয় হাসপাতালের সেই যুবকটির কথা। মনে মনে বলি, 'নেক কাজের পথ দেখিয়ে কত সাওয়াব তুমি পেয়ে গেলে হে পুণ্যবান!'

সৌভাগ্য

জীবনের ঝলমলে রোদ্দুরে থেকো না বিভোর হয়ে
কালের গর্ভেও লুকিয়ে থাকে সীমাহীন বিভীষিকা
তারাভরা আকাশ দেখে নিয়ো না স্বস্তির নিঃশ্বাস
রাতের স্নিগ্ধতাও বিচূর্ণ করে দুর্যোগের ঘনঘটা।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে যায়। আমার আশাতীত সাফল্যে খুশি হয় সবাই। কয়েক মাস পরেই আমি ভার্সিটিতে ভর্তি হব। শুরু হবে জীবনের নতুন একটি পর্ব। প্রাণভরে বিচরণ করব ভার্সিটির বিস্তৃত অঙ্গনে। জীবনকে আবিষ্কার করব আরও বিস্তীর্ণ পরিসরে। কল্পনার হাওয়ায় দোল খায় কত স্বপ্ন, কত প্রত্যাশা।

হঠাৎ আম্মুর মুখে অদ্ভুত এক খবর শুনি। নিমিষেই কেটে যায় আমার উৎফুল্ল ভাব। আব্বুর এক বন্ধুর ছেলে নাকি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সে আমেরিকা পড়ে। আব্বু সব কথা পাকা করে ফেলেছেন। বিস্ময়ে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। কী করব কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। আব্বুর কথায় কোনো নড়চড় হবে না আমি জানি। তাই আমিও নিজেকে ছেড়ে দিই নিয়তির ওপর। কী হয় দেখা যাক।

সেদিন রাতে আম্মুর কাছে জানতে পারি, বিয়ের পর তার সাথে আমাকেও আমেরিকা চলে যেতে হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি কেবল ভাবি। অন্তরে জেগে থাকে অদ্ভুত এক কৌতূহল। আমেরিকা যাব আমি! সেখানে কেমন হবে আমার জীবন? হঠাৎ বুকের কোথাও যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। ইস!

কত তাড়াতাড়ি আমাকে হারাতে হচ্ছে আব্বু-আম্মুকে—ছেড়ে যেতে হচ্ছে আদরের ভাইবোনদের। একটি ব্যাপার আমার কিছুতেই বুঝে আসে না—এইটুকু একটি মেয়েকে তারা কীভাবে প্রবাসী এক যুবকের হাতে তুলে দিচ্ছেন?

সময় যেন খুব দ্রুতই কেটে যায়। দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে আমার বিয়ে। যথারীতি সম্পন্ন হয় সব কাজ। আমি স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা চলে যাই। চমৎকার একটি বাড়িতে গিয়ে উঠি আমরা—মহাসুখে উপভোগ করি মধুচন্দ্রিমা। হাসি-আনন্দের দোলাচলে কাটতে থাকে আমাদের দিন। পৃথিবীটা কেমন যেন রঙিন মনে হয়। স্বামী আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক শহর থেকে আরেক শহরে। আমাকে পরিচিত করে তোলে আমেরিকার সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে। সে বলে, 'আমাদের আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।' উন্নত বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাকে অভ্যস্ত করে তুলতে তার যেন উৎসাহের অন্ত নেই। ধীরে ধীরে আমার দ্বিধা ও সংকোচও কাটতে থাকে।

নির্মেঘ পরিচ্ছন্ন দিনগুলো যেন দ্রুতই শেষ হয়ে আসে। আমার এখন যতদূর মনে পড়ে—আমেরিকান সংস্কৃতি রপ্ত করতে গিয়ে একটি পর্যায়ে এসে আমরা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাই—যা আমাদের বোধ-বিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সহসা যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায় আমাদের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ।

আমাদের দ্বীনি অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। সালাত আদায়ের মানসিকতাই বিদায় নেয় আমাদের মন থেকে। তখন আমাদের একটিই চেষ্টা—আমাদের সব দিক দিয়ে সভ্য ও সংস্কৃতিমনা হয়ে উঠতে হবে।

ধীরে ধীরে আমার স্বামীর মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসে। সে দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটাতে শুরু করে। বিশেষ করে রাতে সে ঘরে আসেই না। এই তিন বছরে আমাদের কোনো সন্তানও হয়নি। এ কারণে আমাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রটি যেন আরও প্রশস্ত হয়। কোনোভাবেই আর আমরা একে অপরকে সহ্য করতে পারি না। সারাক্ষণ টানাপোড়েন লেগেই

থাকে দুজনের মধ্যে। কথায় কথায় কয়েক বার আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ারও উপক্রম হয়।

তিন বছর পর যখন দেশে ফিরি, আমার পরিবার আমার কষ্টের বিষয়টি বুঝতে পারে। আমিও সবকিছু খোলাখুলি আম্মুকে জানাই। তিনি পুরো ব্যাপারটি আব্বুর নজরে আনেন। একদিন আব্বু আমাকে একান্তে ডাকেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সবকিছুর খুঁটিনাটি তিনি জেনে নেন। আমাকে কিছুদিন সময় দেন বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবার জন্য। অবশেষে আমি তালাক চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি মনে করি, তালাকের বিষয়টি বেশ সহজ হবে। কেননা, আমেরিকা থাকাকালীন বেশ কয়েক বার আমরা তালাকের ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু দেশে ফিরে সে এ ব্যাপারে গড়িমসি শুরু করে—অনেকগুলো শর্ত জুড়ে দেয়। তার সবচেয়ে বড় দাবি সম্পূর্ণ মোহর ফেরত দিতে হবে। অবশেষে বিরক্তিকর দিনগুলো বিদায় হয়। তালাকের সময় বাড়াবাড়ি দেখে তার প্রতি আমি আরও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠি। আমেরিকা থাকার দিনগুলোতে তার পড়াশোনায় আমি অনেক সহায়তা করেছিলাম। আমার সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলাম তাকে গড়ে তোলার আশায়। বলতে গেলে ওই তিনটা বছর আমি তার পেছনেই নিঃশেষ করেছিলাম। এত কিছুর পরও আজ আলাদা হয়ে গেল আমাদের চলার পথ! ভাবতেই কেমন মন খারাপ হয়ে যায়।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আমি আবার ফিরে আসি আমার আগের জীবনে। ভর্তি হতে যাই ভার্সিটিতে। যেহেতু বছরতিনেক আমেরিকা কাটিয়ে এসেছি—ইংরেজিতে আমার বেশ দখল চলে এসেছে। আমি ইংরেজি অনুষদে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো ভিন্ন ছিল। ঘটনাচক্রে আমার পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাকে ইংরেজি অনুষদে ভর্তি হওয়ার কথা বললে সে আমাকে বলে, 'তুই বরং ইসলামিক স্টাডিজে এডমিশন নে।' দীর্ঘক্ষণ কথা বলে কীভাবে যেন সে আমাকে রাজি করিয়ে ফেলে। ইসলামিক অনুষদের অনেক উপযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা বলে আমাকে সে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ করে সেমিনার, লেখালেখি, বক্তৃতা ইত্যাদির মতো পাঠ্যক্রম

বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগটি আমার বেশ লোভনীয় মনে হয়। আমি যেন আবার ফিরে যাই সেই কৈশোর বেলায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই আমার এসবের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। আল্লাহর ওপর ভরসা করে ইসলামিক স্টাডিজে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

খুব দ্রুত আমি বান্ধবীদের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠি। পড়াশোনায় বেশ মনোযোগ দিই এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্মসূচিগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করি। বিভিন্ন সেমিনার ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে আমিই হয়ে উঠি সবার মধ্যমণি। যেকোনো অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিন্যাস ও আয়োজনে আমি ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ি। আমার মনমরা ভাব কেটে যেতে শুরু করে। জীবন যেন আবার ফিরে পায় তার স্বাভাবিক ছন্দ। আম্মু খুব খুশি হন আমার অবস্থা দেখে।

আমি সব সময় ব্যস্ত সময় কাটাই। কখনো ক্লাসের পড়া তৈরি করি। কখনো বিভিন্ন ইসলামি পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ি। কখনো-বা সেমিনারে বক্তব্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুতি করি। ক্রমশ আমার হৃদয়ে ফিরে আসে হারানো মনোবল। আশেপাশের সুন্দর পরিবেশ আমাকে দ্বীনের প্রতি যত্নশীল করে তোলে। ফরজ ইবাদতসমূহ আদায়ের পাশাপাশি নফলেও মনোযোগী হই। আমার অনেক বান্ধবী নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে এবং নফল সাওম আদায় করে। তাদের দেখাদেখি আমিও অভ্যস্ত হয়ে উঠি। এত সুন্দর দ্বীনি পরিবেশ পেয়ে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি।

একবার কয়েক জন বান্ধবী মিলে ঠিক করি, আমরা কুরআন হিফজ শুরু করব। আমার ভয় ছিল, সবার সঙ্গে হিফজ চালিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবকিছু সহজ করে দেন। আকিদা ও ফিকহের দিকেও আমি মনোযোগী হই।

আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল—এখন বুঝতে পারি, আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া মানে পৃথিবীতেই জাহান্নাম রচনা করা। বাড়িতেও আমি দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করার দিকে মনোযোগী হই। আমার বোনও আমার সঙ্গে কুরআন হিফজ শুরু করে।

প্রতিদিন কুরআনের একটি নির্দিষ্ট অংশ আম্মুকে শোনাই। মহিলাদের প্রয়োজনীয় মাসায়িল নিয়ে আলোচনা করি। বড় বড় শাইখদের বিষয়ভিত্তিক বয়ানের ক্যাসেটও সংগ্রহ করি ছোট ভাইকে দিয়ে। কোনো বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গেলেই হাদিয়া হিসেবে বই বা ক্যাসেট নিয়ে যাই।

এভাবে আমার জীবন আমূল পাল্টে যায়। আমেরিকার সেই অশ্লীল বেহায়া সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকুও আমি মুছে ফেলি হৃদয় থেকে। দুনিয়াকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করি। আমি উপলব্ধি করতে পারি, এই পৃথিবী আমাদের আসল ঠিকানা নয়—আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত বা জাহান্নাম।

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

বছরদুয়েক পরের কথা। আমার সাবেক স্বামী পড়াশোনা শেষে আমেরিকা থেকে ফিরে আসে। তার আম্মু আমাদের বাড়িতে এসে আমার আম্মুর সঙ্গে কথা বলে—ক্ষমা চায় তাদের আচরণের জন্য এবং অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে আমাকে আবার বউ হিসেবে ঘরে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হই না—তার আম্মুর কপালে চুমু খেয়ে বলি, আমি অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। আমি আর ওদিকে পা বাড়াতে চাই না। যাওয়ার সময় আমি তার জন্য তাওবা ও মুহাসাবা-বিষয়ক কিছু বই ও ক্যাসেট হাদিয়া পাঠাই।

ওফ! একটি কথা বলতে ভুলে গেছি তোমাদের। এই সময়গুলোতে অনেক যুবকের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে আমার কাছে। বিশেষ করে আমার এক বান্ধবীর ভাইয়ের প্রস্তাব আমার বেশ ভালো লাগে। কিন্তু আমি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসি—তাদেরকে জানিয়ে দিই, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছি কুরআন পরিপূর্ণ হিফজ না করে আমি বিয়ে করব না।

আমার ভার্সিটির শিক্ষাজীবন ও কুরআন হিফজ দুটোই একসঙ্গে শেষ হয়। আমার ইচ্ছা ছিল, ভার্সিটিতেই আমি শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। বাড়ির বেশ কাছেই একটি মাদরাসায় আমি নিয়োগপ্রাপ্ত হই। সেখানেও আমি ছাত্রীদের নিয়ে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত

বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করি। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কুরআন হিফজের প্রতি। নতুন মাদরাসায় বেশ চমৎকারভাবে কাটে আমার দিন। মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিয়ে যেন আমরা আলাদা একটি পরিবার হয়ে উঠি।

একদিন আমার সেই বান্ধবী আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসে। আমাকে সেই ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে, 'এখন তো আর কোনো অজুহাত নেই তোমার। কুরআন হিফজও শেষ—আর পড়াশোনার পাটও চুকিয়ে ফেলেছ।' আমি রাজি হয়ে যাই। সুন্নাত মুতাবেক সবকিছু সুসম্পন্ন হয়। কোনো অপচয় নেই, জাঁকজমক নেই, হই-হুল্লোড় নেই। আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্বামী দ্বীনদার পরহেজগার আলিম। সুন্নাতি লিবাস। নফল ও কিয়ামুল লাইল কিছুই বাদ যায় না তাঁর। পরম সুখে কাটে আমাদের দাম্পত্য জীবন। আমরা যেন পরস্পরের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এতদিনে যেন পূরণ হলো আমাদের সুখস্বপ্ন। একদিন তিনি কথায় কথায় আমাকে বলেন, 'কুরআন হিফজের আগ্রহ দেখেই তোমাকে কাছে পেতে মন চেয়েছিল আমার।'

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করেন। যিনি আমেরিকার বিষাক্ত সংস্কৃতির মরণ ছোবল থেকে আমাকে হিফাজত করেছেন। সুন্দর দ্বীনি পরিবেশে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেছেন। দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাসে পরিণত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই আমাকে তুলে এনেছেন সৌভাগ্যের রাজপথে।

মৃত্যুর ভয়

নিয়ত মৃত্যুর খবর আসে
খাটিয়ায় চড়ে গোরস্তানে যায় কত প্রিয়জন
আপন হাতে কত লাশ মোরা করেছি দাফন
কিন্তু খানিক বাদেই ভুলে যাই সব
ক্ষণিকের মলিন চেহারা হেসে ওঠে ফের
আলোহীন বিকৃত এক উল্লাসে।

আমার প্রাথমিক শিক্ষার বয়সটা কাটে আব্বু-আম্মুর সঙ্গে—পরিবারের ছকবাঁধা দ্বীনি পরিবেশে। আম্মুকে প্রায়ই দেখতাম হাতদুটো আসমানের দিকে মেলে ধরে নীরবে দোয়া করছেন। রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেও শুনতাম তাঁর মিহি স্বরে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ। আব্বু কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত ছিলেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন যে, আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারতাম না। বিশেষ করে শীতের মৌসুমে কম্বলের গরম উম ফেলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন জায়নামাজে। আমি খুব বিস্মিত হতাম—এত সবর কোথায় পান তিনি! প্রতিদিন এই একই দৃশ্য। আসলে তখনও আমি বুঝতাম না যে, সালাতেই মুমিন খুঁজে পায় চিত্তের প্রশান্তি। রবের দরবারে লুটিয়ে পড়াতেই তার যত আনন্দ। দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতেই সর্বক্ষণ আকুলি-বিকুলি করে তার মন।

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে আমি একটি সামরিক বিভাগে যোগ দিই। ছয় মাসের মধ্যেই সফলভাবে সমাপ্ত হয় আমার প্রশিক্ষণ। এভাবে আরম্ভ হয় আমার

কর্মজীবন। তারুণ্যে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তাধারায়ও আসতে থাকে ব্যাপক পরিবর্তন। বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে আমার দূরত্বটাও যেন বাড়তে থাকে। অবশ্য কখনো আমার মনে পড়ে যায়, আব্বু-আম্মুর কথা, তাদের নসিহতের কথা—তাদের অপূর্ব দ্বীনদারির কথা।

আমার প্রথম পোস্টিং পড়ে বহু দূরের এক শহরে। সহকর্মীদের অনেকেই পরিচিত হওয়ায় এত দূরে গিয়েও অতটা মন খারাপ হয়নি আমার। আপন পরিবার ও শহর ছাড়ার কষ্ট খুব একটা আচ্ছন্ন করতে পারেনি আমাকে। তবে এখন আর আমি শুনতে পাই না আম্মুর সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত। ফজরের সালাতের সময় মাথায় হাত বুলিয়ে জাগিয়ে দেয় না কেউ। সময়মতো মসজিদে যাওয়ার জন্য আর উৎসাহ পাই না কারও কাছ থেকে। অদ্ভুত একাকী জীবন—যেখানে পারিবারিক পরিবেশের কোনো ছিটেফোঁটাও নেই। আমার ফেলে আসা দিনগুলোর সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই এই নতুন জীবনের।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি হাইওয়েতে পড়ে আমাদের ডিউটি। নগরীর নিরাপত্তা বিধান, রাস্তায় টহল দেয়া, গাড়ি চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা, যাত্রী ও পথচারীদের সাহায্য ইত্যাদিই আমাদের মূল দায়িত্ব। বেশ কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করি।

নতুন এই জীবনে খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠি আমি। সবকিছু আমার ভালো লাগতে শুরু করে। তখন আমার ভর-যৌবন—অন্তরের পর্দা তুলে উঁকি মারে কত আশা কত প্রত্যাশা। অপার কৌতূহল নিয়ে আমি দেখি চারপাশের পৃথিবী। কাজের ফাঁকে আমাদের অফুরন্ত অবসর।

সময় গড়াতে থাকে তার আপন গতিতে। কখনো কখনো গৎবাঁধা জীবনে এক ধরনের বিরক্তি এসে জন্ম নেয় মনের কোনে। দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করার মতো কেউ নেই এখানে। অথচ দ্বীন থেকে দূরে ছিটকে পড়ার যাবতীয় আয়োজন ঠিকই আছে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ডিউটি পালন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কত ঘটনাই আমাদের চোখে পড়ে—দেখতে হয় কত মর্মান্তিক দৃশ্য। একদিনের কথা। আমি আর আমার এক সহকর্মী রাস্তার পাশে টহল দিচ্ছি—এমন সময় হঠাৎ বিকট একটি শব্দ কানে আসে। দ্রুত শব্দের উৎসের দিকে দৌড়ে যাই। খানিকটা দূরে দুটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। চোখের পলকে আমরা ঘটনাস্থলে হাজির হই। নিকটবর্তী ক্যাম্পে ফোন করে আমরা দুজন উদ্ধারকর্মে লেগে যাই। গা শিউরে ওঠার মতো দৃশ্য। একটি কারের দুজন যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া দরোজা ভেঙে অনেক কষ্টে তাদের গাড়ি থেকে বের করে আনি। রাস্তার একপাশে তাদের শুইয়ে রেখে অন্য গাড়িটির দিকে মনোযোগ দিই। আমরা কাছে যাওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কারের একমাত্র আরোহী চালক। বাহু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে তার হাতদুটি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা।

তাকে রেখে আমরা দ্রুত মুমূর্ষু লোকদুটির নিকট ফিরে আসি। রক্তে ভিজে গেছে তাদের পোশাক। চোখগুলো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যন্ত্রণায় ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর। কাছের হাসপাতালে ফোন করা হয়েছে। একটু পরই চলে আসবে অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু তাদের জখম মারাত্মক। বেঁচে থাকার আশা নেই বললেই চলে। আমার সহকর্মী তাদের কালিমার তালকিন করার চেষ্টা করে—

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’

আশ্চর্য কাণ্ড! তালকিনে কান না দিয়ে উচ্চ স্বরে গান ধরে তারা! মুখ থেকে ছলকে বেরুচ্ছে রক্ত। গানের কলিতে কাঁপছে রক্তাক্ত ঠোঁট। লাল জিহ্বা বেরিয়ে আসছে একটু পরপর। জঘন্য এই অবস্থা দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে আমার অন্তরাত্মা।

আমার সহকর্মী বেশ সাহসী। মুমূর্ষু মানুষের অবস্থা সে ভালোই বুঝতে পারে। সে বারবার তালকিন করতে থাকে। আমি নির্বাক চেয়ে থাকি। এমন দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। এমনকি কোনো মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম অবস্থা কাছ থেকে দেখার সুযোগও আমার এই প্রথম।

আমার সহকর্মী যতই কালিমার তালকিন করে, তারা শোনে না। আপন মনে গাইতে থাকে। দূর থেকে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শোনা যায়। ক্রমশ নিচু হয়ে আসে তাদের গানের আওয়াজ। একসময় শোনা যায় ফিসফিস ধ্বনি। একজনের দেহ হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে—পরক্ষণেই নিথর হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। দ্বিতীয় জনও একই পথ ধরে খানিক পরেই।

লাশ-তিনটির আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। আমার সহকর্মীর মুখে বিষাদের ছায়া। গভীর এক ভাবনায় ডুবে আছে সে। ফেরার পথে পুরো সময়টা জুড়ে আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে বিষণ্ন এক নীরবতা। ক্যাম্পে ফিরে একটু স্বাভাবিক হয়ে প্রথম মুখ খুলে সে। উদাস কণ্ঠে বলে, 'মানুষের মৃত্যু কখনো ভালো হয় আবার কখনো বেশ খারাপ হয়। আজকের মৃত্যুদুটি খারাপ হওয়ার আলামত স্বচক্ষে আমরা দেখলাম। মানুষ সারা জীবন যে কাজে নিবিষ্ট মনে নিমগ্ন থাকে—মৃত্যুর বিভীষিকাময় মুহূর্তে এসেও দেখা যায় কঠিন যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সে একই কাজটিই করে বসে।' সে আমাকে এরূপ আরও অনেক মুমূর্ষু লোকের ঘটনা শোনায়। বিভিন্ন ইসলামি কিতাব থেকেও অনেক শিক্ষণীয় কাহিনী তুলে ধরে। বুঝিয়ে বলে কেন এমনটি হয়।

মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে করতে ভয়ে শিরশির করে ওঠে আমার শরীর। চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে রক্তভরা মুখে গান গাওয়ার সেই বিভৎস দৃশ্য। এর পর থেকে আমার মন বেশ নরম হয়ে যায়। অনেক বড় একটি সবক হাসিল করি এই ঘটনা থেকে। সেদিন আমি বেশ ভাঙা দিল নিয়ে ভীত অবস্থায় সালাত আদায় করি।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ধীরে ধীরে আমার মন থেকে এই অনুভূতি মুছে যেতে শুরু করে। আবার ভুলে যেতে থাকি জীবনের পরম পরিণতির কথা। মনটা ক্রমশ শক্ত হয়ে ওঠে। আমি ফিরে যাই সেই আগের জীবনে। যেন কিছুই দেখিনি। মৃত্যুর কথা আর আমার মনেই পড়ে না। তবে গানের প্রতি আমার চরম বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। গান শোনার বদঅভ্যাস চিরদিনের জন্য ত্যাগ করি। হয়তো

মুমূর্ষু লোকদুটির রক্ত মুখে গান গাওয়ার বিভৎস দৃশ্যটা এখনো জেগে থাকে অবচেতন মনে। গানের আওয়াজ শুনলেই ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার শরীর।

ভবিষ্যৎ চির রহস্যময়। সময়ের আড়ালে কী লুকিয়ে থাকে বোঝা বড় দায়। ওই ঘটনার পর ছয় মাসও কাটেনি—ঘটে যায় আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা। নগরের প্রবেশপথে একটি বড় সড়ক তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ করে। এক ব্যক্তি স্বাভাবিক গতিতে সুড়ঙ্গ পথে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ তার সামনের একটি চাকা ফেটে যায়। দ্রুত একপাশে পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সে। গাড়িতে অতিরিক্ত চাকা ছিল। চাকা বদলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বের করতে সে পেছনের টুল বক্স খুলতে যায়। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে বড় একটি ট্রাক এসে আছড়ে পড়ে তার থামানো গাড়ির ওপর। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তার গাড়ি। সুড়ঙ্গের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে লোকটি ছিটকে পড়ে রাস্তায়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে পুরো সুড়ঙ্গ। আমি আর আমার জনৈক সহকর্মী কাছেই টহল দিচ্ছিলাম। আওয়াজ শুনে আমরা দ্রুত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি। পাঁজাকোলা করে তাকে বাইরে নিয়ে আসি। সেই সঙ্গে ফোন করি নিকটবর্তী হাসপাতালে। উঠতি বয়সের এক তরুণ সে। ফর্সা চেহারায় পবিত্রতার ছাপ। মুখভর্তি কালো দাড়ি। সুড়ঙ্গ থেকে বের করার সময় সে কী যেন পড়ছিল। উত্তেজনায় সেটা আমরা খেয়াল করিনি। এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার গলা। সুবহানাল্লাহ! কুরআন তিলাওয়াত করছে সে। মনে হয় তার কিছুই হয়নি। রক্তে ডুবে আছে তার শরীর। হাড় ভেঙে বাঁকা হয়ে আছে তার হাত-পা। কিন্তু প্রশস্ত ললাটজুড়ে প্রশান্তির ছায়া। স্থির শীতল কণ্ঠে একটানা তিলাওয়াত করে যাচ্ছে। হৃদয় উজাড় করা সেই আশ্চর্য তিলাওয়াত, আবেগে প্রকম্পিত সেই পবিত্র আওয়াজ—মনে হয় দূর থেকে ভেসে আসছে অপার্থিব শব্দমালার অপূর্ব ঝংকার। সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত এক যুবকের সুললিত তিলাওয়াত একটানা সুধা বর্ষণ করে যায় আমাদের কর্ণকুহরে। শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় কম্পনের এক শীতল স্রোত। হঠাৎ ঘোর কেটে যায় আমাদের। তিলাওয়াতের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাই যুবকটির দিকে। একটু নড়েচড়ে

ধীরে ধীরে স্থির হয় সে। ডান হাতের শাহাদাত আঙুলটা ঈষৎ উঁচু করে ধরে টেনে টেনে সে উচ্চারণ করে কালিমার শব্দগুলো—

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'

তারপর একদিকে কাত হয়ে যায় তার চেহারা। আমরা ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে আসি। পরক্ষণেই তার দিকে ছুটে যাই। বুকে হাত রাখি—পালস চেক করি। নাহ! সব ঠান্ডা। কোথাও এতটুকু নড়াচড়া নেই। নিথর নিঃসাড় হয়ে আছে তার শরীর।

নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি তার সুন্দর চেহারার দিকে। মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। ততক্ষণে এসে যায় কর্তব্যরত লোকেরা। আমি অশ্রু লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অ্যাম্বুলেন্স ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে।

ফেরার পথে কান্নায় ভেঙে পড়ে এতক্ষণ শক্ত হয়ে থাকা আমার সহকর্মী। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। হৃদয়ে যেন বয়ে যায় মরু সাইমুম। অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে দুচোখের দৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক পর শেষ হয় আমাদের ডিউটির সময়। দুজনই দ্রুত হাসপাতালে চলে যাই। অনেক মানুষের ভিড় সেখানে। আমরা পুরো ঘটনা খুলে বলি। সবাই তন্ময় হয়ে শোনে যুবকের মৃত্যুর সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী। অনেকেই চুমু খায় ভাগ্যবান এই যুবকের কপালে। সবাই ওর জানাজা কখন হবে? কোথায় হবে?—এসব জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কর্তব্যরত এক কর্মকর্তা ফোন করে মৃতের বাসায়। ফোন রিসিভ করে তার ভাই। খবর পেয়ে ছুটে আসে তারা।

তার ভাইয়ের সঙ্গে আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বলি। যুবক সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর নিই—সে কেমন ছিল? কী করত? তার ভাই জানায়, 'সে গাড়িতে চড়ে গ্রামে বৃদ্ধ দাদিকে দেখতে যাচ্ছিল। প্রতি সোমবারে সে একবার করে যেত সেখানে। ফকির, মিসকিন, বিধবা ও এতিমদের নিয়ে কাজ করত। ওই গ্রামের সবাই তাকে চিনত—ভালোবাসত প্রাণভরে। কিশোর ও যুবকদের জন্য সে গাড়ি ভর্তি করে ইসলামি বই এবং বয়ানের ক্যাসেট নিয়ে যেত। কখনো চাল, ডাল, চিনি ইত্যাদি নিয়ে পৌঁছে যেত অভাবীদের

দুয়ারে দুয়ারে। শিশুরা তাকে দেখলে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। তাদের জন্য মিষ্টি, হালুয়া, চকোলেটও নিতে ভুলত না সে। গাড়ি নিয়ে এত লম্বা সফরে যেতে পরিবার থেকে অনেক সময় নিষেধ করা হতো। সে বলত, "সফরের সময়গুলোই তো আমার সবচেয়ে ভালো কাটে। আমি গাড়িতে বসে কুরআন তিলাওয়াত করি। অডিও প্লেয়ারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি আলোচনা শুনি। সফরের প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে অনেক মূল্যবান।"'

পরদিন মসজিদের পাশের ইদগাহে অনুষ্ঠিত হয় তার জানাজা। লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে চারদিক। এত মানুষের সমাগম দেখে মনটা কেমন আনচান করে ওঠে। আহা! অল্প বয়সের এক যুবক—মানুষের কাছে কতটা আপন হয়ে উঠতে পেরেছিল! সবার সঙ্গে আদায় করি জানাজা। শোকাতুর গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজনরা চিরদিনের জন্য বিদায় জানায় এক মহান যুবককে।

প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ হায়াত যদি পাও তুমি এই পৃথিবীতে
সইতে হবে শত বিচ্ছেদ-বেদনা,
আপনজনরা সব হারিয়ে যাবে একে একে
ছোট্ট সুন্দর জীবনই হোক সাধনা।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে মন। হতাশার আঁধারে ছেয়ে যায় সবকিছু। সেই স্বপ্নমুখর অতীত, দুঃখভরা বর্তমান আর অনিশ্চিত আগামীর হাতছানি—জীবনের হিসাব মিলে না কিছুতেই। ভাবতে ভাবতে মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। কাঁপতে শুরু করে দুর্বল শরীরটা। হঠাৎ হাত ছুটে যায় র‍্যালিং থেকে। বুঝতে পারি জ্ঞান হারাতে যাচ্ছি। দ্রুত বসে পড়ার চেষ্টা করি।

জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারি আমি খাটে শুয়ে আছি। এর আগেও কয়েকবার এমন হয়েছে। বেশি টেনশন করলেই আমার রক্তচাপ বেড়ে যায়। চেষ্টা করি মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।

বিয়ের আগে তারা বলেছিল, ছেলেটি অনেক ভালো। স্বভাব-চরিত্র বেশ সুন্দর। তবে দ্বীনের ব্যাপারে একটু অমনোযোগী। আমি চাইলেই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব। একটু চেষ্টা করলেই সে সালাতে মনোনিবেশ করবে। আব্বু চিরকুটে লিখেছিলেন, 'মা আমার! তুই আর অমত করিস না। তোর ছোট বোনের পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেছে। এবার রাজি হয়ে যা। আমার মনে হয়, এই ছেলেটা তোর জন্য উপযুক্ত।' আম্মুও বেশ উৎসাহী ছিলেন এ ব্যাপারে। তিনি বলতেন, 'দেখ, উঁচু বংশের ছেলে আবার ভালো

চাকরিও করে। আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল তারা।' কিন্তু আমি এসবের প্রতি মোটেও আগ্রহী ছিলাম না। বাহ্যিক চাকচিক্য আমাকে কখনো আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি ছেলেটির দ্বীনদারি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। এটিই ছিল আমার একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আমি এমন একজন স্বামী চাই, দ্বীনের পথে যে আমার সাথি হবে—আমাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবে। সে আমাকে ভালোবেসে সম্মানিত করবে বা অপছন্দ করলে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেবে। দ্বীনদারির অভাবে স্বামীর জুলুম ও দাম্পত্য কলহের যেসব হৃদয়-বিদারক ঘটনা শুনতাম, তা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিত।

আমি এমন এক স্বামীর স্বপ্ন দেখতাম, গভীর রাতে যে আমাকে সালাতের জন্য জাগিয়ে দেবে। শেষ রাতে উঠে আমি প্রায়ই আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতাম—'আল্লাহ্ এমন একজন নেককার জীবনসঙ্গী আমায় দান করো, যে দ্বীনের পথে আমার সহায় হবে। আমরা দুজন হাতে হাত রেখে শপথ নেব তোমার আনুগত্যের—প্রিয়নবির সুন্নাত ও সাহাবিদের অনুসৃত পথে চলার।'

আমি এমন এক যুবকের স্বপ্ন দেখতাম, যে আমার সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় বড় করে তুলবে। কল্পনায় দেখতাম, সন্তানের হাত ধরে মসজিদে যাচ্ছে আমার স্বামী আর আমি দাঁড়িয়ে আছি দরোজায়। বাসায় ফিরে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, কুরআন কতটুকু হিফজ করেছ আজ? কত পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করেছ?

আমি স্বপ্ন দেখতাম, সন্তানের হাত ধরে কাবার সামনে গিয়ে দোয়া করব। আমার অনেক সন্তান হবে—যাদের হাতে প্রজ্জ্বলিত হবে তাওহিদের মশাল। যারা মানুষকে আহ্বান করবে দ্বীনের পথে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আলহামদুলিল্লাহ। এখনো হারিয়ে যায়নি আমার স্বপ্ন। হতাশার আঁধারেও আমি জ্বালিয়ে রাখি আশার প্রদীপ। স্বামীর সবকিছু নীরবে সহ্য করে যাই। বিয়ের পর প্রথম প্রথম তাঁকে সালাতের প্রতি কিছুটা মনোযোগী করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করতে শুরু করলেন।

জামাতে সালাত আদায়ের জন্য খুব বেশি চাপ দিলে তিনি বলেন, 'কী শুরু করলে তুমি? আল্লাহ তাআলা অনেক দয়ালু—পরম ক্ষমাশীল। সালাতের এখনো ঢের দেরি।' এই বলে তিনি আর মসজিদে যান না। এদিকে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। তবুও আমি বুঝতে পারি, এতটুকু বলার কারণে তার অবস্থা কিছুটা হলেও ভালো থাকে। অন্তত আমি তা-ই মনে করি।

কথা প্রসঙ্গে একবার জানতে পারি, তার কিছু বাজে সঙ্গী আছে। আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি—তাদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন কি না। নতুন কোনো উপায়ের ব্যাপারে ভাবতে থাকি—যা আমার মৌখিক নসিহতের চেয়ে বেশি কার্যকর হবে। হঠাৎ মাথায় একটি চিন্তা আসে—আমি তো চাইলে নেককার কোনো যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। আমার এক বান্ধবীর স্বামী বেশ দ্বীনদার পরহেজগার ও চরিত্রবান। ওই বান্ধবীকে ফোন করে সব জানাই। সেও রাজি হয় এবং তার স্বামীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে।

আমি স্বামীকে বলি, আমার এক বান্ধবী তার স্বামীকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসবে। তিনিও সম্মত হন। পরের সপ্তাহে তারা বেড়াতে আসে। আমি খুশিতে আত্মহারা। আল্লাহ তাআলা হয়তো উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে দেবেন। ড্রয়িং রুমে বসে তাদের দীর্ঘ আলাপ করতে দেখে আশান্বিত হয়ে ওঠে আমার মন। বিকেলে চলে যায় বান্ধবী। বাড়ির সদর দরোজায় তাকে বিদায় দিয়ে আমি দ্রুত স্বামীর কাছে ফিরে আসি। তার চোখের দিকে তাকাই—দেখি কী বলেন তিনি। 'তোমার বান্ধবীর স্বামী অনেক উন্নত মানসিকতার অধিকারী। কথাবার্তায় বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হলো।' এইটুকু বলেই তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেন। তার সঙ্গে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ করবেন—এমন কোনো আভাস দেখা যায় না তার চেহারায়। যদিও আমাকে নিয়ে তাদের কাছে বেড়াতে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন তিনি।

আমি নানানভাবে চেষ্টা করতে থাকি। কীভাবে তাকে সালাতে অভ্যস্ত করে তোলা যায়—এই ছিল আমার সর্বক্ষণের ভাবনা। দেড় বছরের মাথায় প্রথম সন্তানের মুখ দেখি আমরা। এরপর আমি সালাতের ব্যাপারে চাপ দেয়া আরও বাড়িয়ে দিই। দীর্ঘক্ষণ রাত জেগে সালাত আদায় করি। আল্লাহর

দরবারে তার হিদায়াতের জন্য অশ্রু ঝরাই। ওদিকে তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হই-হুল্লোড়ে ব্যস্ত সময় কাটান। আমি সিদ্ধান্ত নিই, এখন থেকে বেড রুমেই সালাত আদায় করব। যাতে তিনি নিজ চোখে দেখতে পান। হয়তো এতে তিনি কিছুটা হলেও প্রভাবিত হবেন।

পরদিন বিকেলে তিনি আমাকে বলেন, 'আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে দাও। শহরের বাইরে যেতে হবে আমাকে। অফিসের একটি জরুরি কাজ পড়েছে।' এরূপ প্রায়ই তিনি শহরের বাইরে যান। সেখানে গিয়ে কখনো ফোন করেন—জানান কোথায় উঠেছেন। আবার কখনো জানান না। আমিও এসব জানার চেষ্টা করি না। একজন মুসলিমের প্রতি সুধারণা রাখতে তো কোনো সমস্যা নেই।

সফরের সময়গুলোতে আমি তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি। পরের দিন তিনি ফোন করেন। কোথায় উঠেছেন জানান। আমাকে ফোন নাম্বার দেন হোটেলের রুমের। আমি স্বস্তির নিশ্বাস নিই। প্রতিদিন কাজ শেষে হোটেলে ফিরে তিনি আমাকে ফোন করেন। তৃতীয় দিন হঠাৎ তার ফোন বন্ধ পাই। চতুর্থ দিনও একই অবস্থা। আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে থাকি। পঞ্চম দিন বিকেলে তিনি ফোন রিসিভ করেন। ভাঙা কণ্ঠ শুনে বুকটা ধক করে ওঠে। মনে হয়, অনেক কষ্টে কথা বলছেন তিনি। ফিসফিস করে বলেন, 'আগামীকাল রাতে আমি ফিরছি ইনশাআল্লাহ।' আমি বারবার জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে আপনার? আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?' উত্তর না দিয়ে ফোন কেটে দেন তিনি।

সেদিন রাতে চিন্তায় আমার আর ঘুম হয়নি। দুচোখ ভরে আসে অশ্রুতে। কী হলো আমার স্বামীর? কোনো বিপদে পড়ে গেলেন না তো আবার? পরের দিন রাত দশটার সময় তিনি ঘরে ফেরেন। বিধ্বস্ত চেহারা। উষ্কখুষ্ক চুল। ঘরে প্রবেশ করেই ধপাস করে বসে পড়েন চেয়ারে। ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে তার দুচোখ বেয়ে। তাঁর অবস্থা দেখে আমিও কাঁদতে শুরু করি। বাচ্চার মতো কাঁদতে থাকেন তিনি। অনেক্ষণ পর কান্না থামে তার। তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুলেন তিনি—

'আমি কাজে যাই অফিসের এক সহকর্মীকে নিয়ে। রাতে থাকার জন্য আমরা হোটেলে পাশাপাশি দুটি রুম নিই। মাঝখানে একটি মাত্র দেয়াল। সারাদিন কাজ সেরে বিকেলে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। প্রথম দুদিন ভালোভাবেই কাটে। তৃতীয় দিন বিকেলে সে একটু তাড়াতাড়িই ফিরে আসে। রাতে একসঙ্গে খাবার খাই আমরা। খেতে খেতে কত গল্প, কত হাসাহাসি। রুমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আমরা ঘুরতে বের হই। পাশের একটি মার্কেটে বসে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আড্ডা দিই। তারপর দুজনেই হোটেলে ফিরে আসি। শুয়ে পড়ি যার যার রুমে। সকালে আবার দেখা হবে। পরদিন আমাদের কাজ শেষ হওয়ার কথা। তাই মনটা বেশ খুশি।

রাতে খুব ভালো ঘুম হয় আমার। সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে আমি ফজরের সালাত আদায় করি। তারপর আমার সহকর্মীকে ফোন দিই। রিসিভ করে না। আরও কয়েকবার চেষ্টা করি। হয়তো অজু-ইসতিনজা সারতে গেছে। ইতিমধ্যে হোটেল বয় নাস্তা নিয়ে আসে আমার রুমে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। আবার ফোন করি তাকে। কোনো সাড়া নেই। আমি তাকে ছাড়া নাস্তা সেরে ফেলি।

আটটা বেজে যায়। তার কোনো খবর নেই। এদিকে কাজে বেরুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার রুমের দরোজায় করাঘাত করি। দরোজা খুলে না। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। রুমে ফিরে এসে আমি হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলি। তারা জানায়, তিনি বাইরে কোথাও যাননি। এখনো রুমে আছেন। আরও আধা ঘণ্টা কেটে যায়। আমি হোটেল কর্তৃপক্ষকে পুরো ঘটনা জানাই। নয়টার দিকে সংরক্ষিত 'মাস্টার কী' দিয়ে বাইরে থেকে লক খুলে আমরা তার রুমে প্রবেশ করি। ধীর পায়ে এগিয়ে যাই তার খাটের দিকে। সোজা হয়ে শুয়ে আছে সে। সালিহ! এ্যাই সালিহ!! ক্রমশ উঁচু হতে থাকে আমার গলা। ডাকতে ডাকতে একেবারে কাছে চলে যাই আমি। দাঁতে জিভ কামড়ে পড়ে আছে সে। বিবর্ণ চেহারা। হাতের পাল্‌স চেক করে দেখি আমরা। নাহ! থেমে গেছে সবকিছু। নীরব নিথর। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এসে যায়। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়—"গতকাল রাতেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে।"

সুস্থ সবল একজন যুবকের হঠাৎ এভাবে চলে যেতে দেখে কেঁপে ওঠে আমার মন। গতকালই তো প্রাণ খুলে হেসেছে সে। শক্ত-সমর্থ সুঠাম দেহ তার। কোনো রোগ আছে বলেও জানি না আমি। অসুস্থতারও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি তার চোখে-মুখে।

জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করি আমি। অদ্ভুত এই জিন্দেগি! কখন কার মওতের ডাক এসে যায়—কেউ জানে না। হঠাৎ করে তো ফুরিয়ে যেতে পারে আমার হায়াতও। এই মুহূর্তে কি আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত? কোথায় আমার আমল? কিছুই তো করিনি!' বলতে বলতে কেঁপে ওঠেন তিনি। তার দুচোখের শুকিয়ে যাওয়া ধারাগুলো সজীব হয়ে ওঠে আবার। টেবিলে মাথা রেখে অঝোর ধারায় কাঁদেন।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে ঘুরে যায় তাঁর জীবনের মোড়। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন আমার স্বপ্নের সেই স্বামী। তিনি আমাকে বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। আমার হিদায়াতের জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছ। অনেক অশ্রু ঝরিয়েছ।' পরের সপ্তাহে আমরা উমরা করতে যাব বলে ঠিক করি। বাইতুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শপথ নেন নতুন এক জীবনের।

আমার সবগুলো তামান্না আল্লাহ পূরণ করেন। সন্তানের হাত ধরে আমি বাইতুল্লাহর সামনে দাঁড়াই। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে আমার প্রার্থনার আওয়াজ। বিদায়ী তাওয়াফ শেষে যখন আমরা ফিরে আসি, স্বামীর হাতে দেখি বেশকিছু কিতাব। আমাকে হেসে বলেন, 'এই দেখো, ইবনে রজবের *জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম*। আর এই যে ইবনুল কাইয়িমের *জাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*। এটি *আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব*। এটি *আল-জাওয়াবুল কাফি*। আর এই দেখো, ছোট্ট পকেট কুরআন। আজ থেকে এটিই আমার সঙ্গী।

জীবনসঙ্গিনী আমার! এগুলোই সম্বল আমাদের—অনন্তের সফরের।' আবেগে ভারী হয়ে আসে তার কণ্ঠ। আমার কর্ণকুহরে গুঞ্জন তোলে তার প্রত্যয়দীপ্ত কথামালা।

দোয়া

জগতের যত রূপ-রস-গন্ধ
শুকিয়ে যাবে নিঃশেষে
মহান রবের করুণা-ধারা
ধরার বুকে সজীব রবে।

বিয়ের পর কেটে যায় দীর্ঘ সাতটি বছর। আল্লাহর রহমতে বেশ সুখময় হয় আমাদের দাম্পত্য জীবন। কোনো কিছুরই অভাব নেই। আল্লাহর কাছে যা-ই চেয়েছি তিনি দিয়েছেন। শুধু একটি তামান্নাই অপূর্ণ রয়ে যায়। এতদিনেও আমাদের কোনো সন্তান হয়নি। জীবনটা কেমন একঘেয়ে মনে হয়।

কত ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি তার কোনো লেখাজোখা নেই। দেশের বাইরে-ভেতরে যেখানেই কোনো ভালো ডাক্তারের খবর পেয়েছি ছুটে গিয়েছি। কত তদবির, কত ওষুধ, কত চেষ্টা যে করেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। আমার আর স্ত্রীর অধিকাংশ কথাই হতো ডাক্তারদের নিয়ে। অমুক ডাক্তার কী বলেছে, অমুক কী পরামর্শ দিয়েছে—এই ছিল আমাদের একমাত্র আলোচনা। এভাবে কেটে যায় আরও দুই বছর। সন্তান লাভের কোনো আলামত নেই। তবুও আমরা হাল ছাড়ি না।

সেদিন আসরের সালাত আদায় করে কাছের মার্কেট থেকে কিছু সওদাপাতি কিনে বাসার দিকে আসছিলাম। রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা। সালাম করে মুসাফাহা করি। ইমাম সাহেব এই মসজিদে এসেছেন সপ্তাহখানেকের বেশি হয়নি। প্রতিদিন মসজিদে

দেখাদেখি হয়। কয়েকবার হাসি-বিনিময়ও হয়েছে। তবে একবারও কথা হয়নি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পরিচিত হই আমরা দুজন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন :

- আপনি বিবাহিত?
- হাঁ।
- ছেলেমেয়ে কয়জন আপনার?
- আল্লাহ্ এখনো সন্তানের নিয়ামত দেননি আমাকে। বিয়ের আজ প্রায় নয় বছর হতে চলল। (বেশ বিষণ্ন শোনায় আমার কণ্ঠ)

ইমাম সাহেবও বয়সে প্রায় আমার কাছাকাছি হবে মনে হয়। আমার কথা শুনে তার চেহারাটা একটু শক্ত হয়ে যায়। কী যেন ভাবেন তিনি। তারপর আমার ডান হাতটি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেন :

- ভাই, আপনার যে সমস্যা, আমারও ঠিক একই সমস্যাটি হয়েছিল। একটি ছোট্ট আমলের অসিলায় আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেন।
- কী সে আমল? (আমার স্বরে ব্যাকুলতা)
- প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর আমি এই দোয়াটি পড়তাম—

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْداً وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ﴾

‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা রাখবেন না। আপনি তো উত্তম ওয়ারিস।’[৪]

আলহামদুলিল্লাহ! আমি এখন সাত সন্তানের জনক।

যাওয়ার সময় তিনি আমার হাতে চাপ দিয়ে বলেন, ‘দোয়াটি ভুলে যাবেন না।’ আমি বাসায় এসে স্ত্রীকে ইমাম সাহেবের কথাটি বলি। সে বলে, ‘সত্যিই! আল্লাহ তাকে রহম করুন। তিনি ঠিক বলেছেন। দুনিয়া আমাদের নিরাশ করেছে। আল্লাহ তাআলাই আমাদের একমাত্র ভরসা।’

---

৪. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৯।

আমরা গভীরভাবে দোয়ায় মনোনিবেশ করি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে নিয়মিত দোয়া করতে থাকি। গভীর রাতে অশ্রু ঝরাই আল্লাহর দরবারে। খুঁজে খুঁজে দোয়া কবুল হওয়ার সময়গুলোতেও দোয়া করি। একসময় আমাদের মনেও জেগে ওঠে এক চিলতে আশা। এক ধরনের প্রশান্তি অনুভূত হয় হৃদয়ে।

অবশেষে আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত ছুঁয়ে যায় আমাদের জীবন। গর্ভবতী হয় আমার স্ত্রী। যথাসময়ে ফুটফুটে এক পুত্র আসে তার কোলজুড়ে। মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে আমাদের মন। কত দয়াময় তুমি হে আমাদের প্রতিপালক! দোয়ার সেই মাহাত্ম্য আমরা কখনো ভুলিনি। আমরা আজও দোয়া করে যাই—

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন।’[৫]

আলোর ভুবন

জীবন-প্রান্তরে যেদিন সন্ধ্যা নামিবে
ঢেকে যাবে সবকিছু নিকষ আঁধারে
আমলের প্রদীপ হাতে যাবে কবরে
নির্জন আলোহীন মাটির ঘরে।

মাথার চুলে শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। এই তো আগামী মাসে পঞ্চাশে পা রাখব। শান্ত নির্ভার আমার জীবন। সন্তানরা সবাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কর্মের ময়দানে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে হাসি-দুষ্টুমি করেই কাটে আমার সময়। কী পাইনি এই জীবনে! সুখ শান্তি সমৃদ্ধি—সব পেয়েছি আমি। ভাবতেই একরাশ নির্লিপ্ততা এসে ভর করে হৃদয়ে।

অনেক দিন হয়ে গেল কোথাও যাই না। উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া বেশ মনোরম। ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসলে ভালো হতো। ছোট ছেলের নতুন স্থাপিত ফ্যাক্টরিটার কী অবস্থা তাও দেখা হয়ে যেত এই ফাঁকে। ঘরে বসে থাকতে থাকতে এক ধরনের অবসাদ অনুভব করছি শরীরে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই আমি। আগামী সোমবার সকালে বের হব। পরিবারকে জানাই বিষয়টা। তারাও সায় দেয়। আয়োজন শুরু করে দেয় আমার লোকেরা।

সেদিন বিকেলের কথা। ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসি সূর্যাস্ত দেখব বলে। মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে। আগামীকাল সফরে বের হচ্ছি এই ভাবনাটা অন্তরের কোথাও যেন মৃদু অস্বস্তি তৈরি করেছে। অনেক ভেবেও কোনো

কারণ খুঁজে পাই না। আমি একঘেয়েমি কাটাতে বাইরে সফরে যাচ্ছি—এখানে মন খচখচ করার কী আছে? হঠাৎ মনের কোথাও যেন জ্বলে ওঠে এক ঝলক আলো। মানুষের মনস্তত্ত্ব বড়ই অদ্ভুত। দীর্ঘদিন বাসায় থেকে পরিবারের সবার সঙ্গে একধরনের একটি ভাব জমে আছে আমার। নাতি-নাতনিদের হাসি, পুত্রবধূদের আদর-যত্ন, ছেলেদের খোঁজখবর, ঘরের চিরচেনা আবহ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে যে একটি কমফর্ট জোন তৈরি হয়েছে আমাকে ঘিরে, এখান থেকে বের হতেই মন সায় দিচ্ছে না আসলে।

ব্যাপারটি আবিষ্কার করতে পেরে মনটা যেন আরও বেশি বিষণ্ন হয়ে ওঠে। অদ্ভুত এই পৃথিবী। প্রিয়জনের মিলনে খুশি হই আমরা—আবার বিরহে হই ব্যথিত। কিন্তু কোনো মিলনই তো স্থায়ী হয় না। আব্বুর কথা মনে পড়ে হঠাৎ। কী হাসিখুশি চেহারা ছিল তার। আমাকে কত ভালোবাসতেন। চোখের আড়াল হতেই দিতেন না। কিন্তু আজ কোথায় সেই আমার প্রিয় আব্বু? আর আমার আম্মু... ভাবতে পারি না আর। অন্তরটা হুহু করে কেঁদে ওঠে বিরহ বেদনায়। একটু সফরে বের হতেই আমার মন খারাপ হচ্ছে! অথচ একদিন আমিও কি আব্বুর পথ ধরব না? সব মায়ার বন্ধন কি একদিন ছিঁড়ে যাবে না? জীবনটা বড়ই অদ্ভুত মনে হয়।

হঠাৎ আমার ছোট্ট নাতি হাম্মাদের কণ্ঠস্বরে ভাবনায় ছেদ পড়ে—'দাদু! নাস্তা করতে এসো।' ব্যালকনি থেকে ড্রয়িং রুমে চলে আসি। টেবিলে নাস্তা দিয়ে গেছে বুয়া। আমাকে ডেকেই ছুটে বেরিয়ে গেছে হাম্মাদ। নিশ্চয় ছাদে খেলতে চলে গেছে আবার। নাস্তা করতে করতে হঠাৎ চোখ পড়ে টেবিলে রাখা অনেকগুলো বইয়ের দিকে। এ নিশ্চয় সালমানের কাজ। বই পড়ার খুব শখ তার। বাড়িতে শুধু তার পড়া বইয়ে একটি মিনি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। আমার বড় নাতি সালমান। ভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজে পড়ে।

বই পড়ার শখ অবশ্য একসময় আমারও ছিল। এখন নেই। সালমান মাঝে মাঝে আমাকে বলে, 'দাদু! তুমি বই পড়লে সময়টা বেশ ভালোই কাটত তোমার।' কিন্তু বই পড়তে আমার ভালো লাগে না। নাস্তা সেরে আমি টেবিলের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসি। নেড়েচেড়ে দেখি বইগুলো। 'জাদুল মুসলিমিল ইয়াওমি'—সুন্দর মলাটের একটি বই। আর ওই বড় বইটি?

‘কিতাবুল আজকার’। এই যে ছোট্ট একটি পুস্তিকা! পনেরো পৃষ্ঠার বেশি হবে না। পড়ে শেষ করতে দশ মিনিটও তো লাগবে না। এত ছোট্ট বইও হয়? যাক! এটি পড়ে দেখি।

এক নিশ্বাসেই যেন শেষ হয়ে যায় পনেরো পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে বিবর্ণ হয়ে যায় আমার চেহারা। অজানা এক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে আমার অন্তরাত্মা। কী পড়ছি আমি এসব?

আমাকে গোসল দেয়া হবে না?

কাফন পরানো হবে না?

জানাজাও হবে না?

আমার দাফনও হবে না মুসলমানদের সঙ্গে?

কী হবে তাহলে? পঞ্চাশ পেরিয়ে যাচ্ছে আমার বয়স। এই কি তাহলে আমার জীবনের শেষ পরিণতি? ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি। সবকিছু মনে হয় অর্থহীন। অন্তরে যেন হাতুড়ি পেটা করছে কেউ।

বইটির নাম ‘হুকমু তারিকিস সালাহ’[৬] বা সালাত ত্যাগকারীর হুকুম। এতে বলা হয়েছে, সালাত ত্যাগকারী কাফির।[৭] এই বুড়ো বয়সে তাহলে আমাকে কাফির বলা হবে? হবেই না বা কেন? আমি তো সালাত ত্যাগকারী।

সালাত ত্যাগকারীর আহকাম বলতে গিয়ে এখানে বলা হয়েছে :

১. সালাত ত্যাগকারীর বিয়ে সহিহ হয় না। আকদ করলেও সে আকদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

---

৬. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রচিত।

৭. সালাত ত্যাগকারীর হুকুম নিয়ে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ﷺ এর মতে সালাত ত্যাগ করা কুফরি—এমন কুফরি যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। যদি তাওবা করে সালাত আদায় না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি ﷺ এর মতে সালাত ত্যাগকারী কাফির নয়, বরং ফাসিক। আবার তার দণ্ডের ব্যাপারে এই তিনজনের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, ‘তাকে হদ হিসেবে কতল করা হবে।’ ইমাম আবু-হানিফা ﷺ এর মতে, তাকে ‘তাজির’ বা উপযুক্ত দণ্ড দেয়া হবে। (শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ, হুকমু তারিকিস সালাহ : ২)

২. আকদের পর সালাত তরক করলে তার বিয়ে ভেঙে যাবে। স্ত্রীর কাছে যাওয়া তার জন্য বৈধ হবে না।

৩. তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। অথচ আহলে কিতাব যেমন ইহুদি বা নাসারা জবাই করলেও পশুর গোশত খাওয়া যায়।

৪. তার জন্য মক্কায় বা হারামের সীমানায় প্রবেশ করা বৈধ নয়।

৫. তার কোনো আত্মীয় মারা গেলে সে মিরাস পাবে না।

৬. সে মারা গেলে গোসল, কাফন, জানাজা কিছুই করা যাবে না। তাকে কাপড়ে পেঁচিয়ে দূরে কোথাও মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। সালাত ত্যাগ করার বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও কোনো বেনামাজির লাশ জানাজা পড়ার জন্য মুসলমানদের সামনে পেশ করা যাবে না।

আফসোস! পুরো জীবন তো স্বপ্নের ঘোরেই কেটে গেল। এখন কী হবে আমার? কোথায় যাব আমি? কী হবে আমার পরিণতি?

কী হবে আমার এই ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আর গাড়ি-বাড়ি দিয়ে? কোন কাজে আসবে জীবনের এই সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি? হৃদয়ের গভীরে একটি প্রশ্নই বারবার ঘুরপাক খায় :

অবশেষে এই ছিল তবে আমার পরিণাম?

পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। আমি আল্লাহকে ভুলে আছি। কেউ আমাকে বলেনি তাঁর কথা। কেউ মনে করিয়ে দেয়নি সালাতের জিম্মাদারির কথা। ইস! কত গাফিল, কত দুর্ভাগা আমি।

তাওবার অশ্রুতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় আমার অতীত। জীবনের হিসাব পাল্টে দিতে আমি আবার দাঁড়িয়ে যাই কোমর বেঁধে। আমার সফর এবার উত্তরাঞ্চল নয়—আলোর ভুবন।
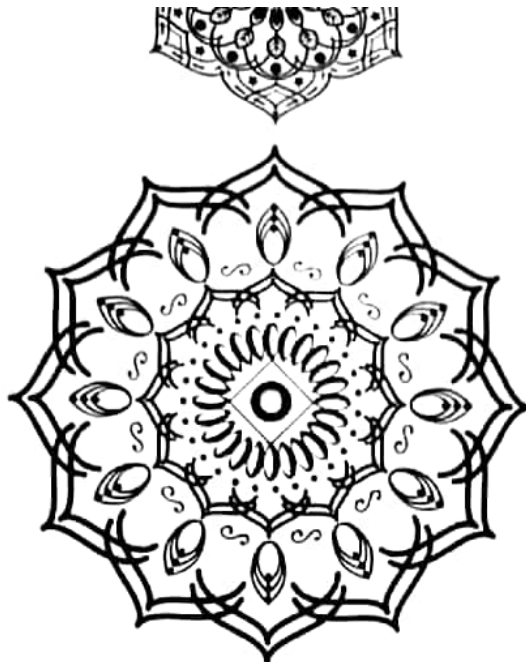
স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

জান্নাতের পাথেয়

দুনিয়া অনন্তের খেত যেয়ো না কো ভুলে
ভরে যাক জীবন-মাঠ আলোর ফসলে।
মায়ার পৃথিবী দেখে হয়ো না বিভোর
এপারের সন্ধ্যা মানে ওপারের ভোর।

আজ বইয়ের পাতায় মন টিকছে না। বারবার ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক। অন্য দিন এতক্ষণে বিশ পৃষ্ঠা পড়া হয়ে যায়। ভাবছি আমার স্ত্রীর কথা। তার সবকিছুই আমার ভালো লাগে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে বেশ অমনোযোগী সে। রাতে তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে এ নিয়ে। নানানভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি—

- দেখো, দুনিয়ার এই জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া কয়েকটি কদম ছাড়া কিছুই নয়। পায়ে পায়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছরের বেশি নয়। আমরা কি তার এক-তৃতীয়াংশের বেশি ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়ে আসিনি? একটু চিন্তা করো, কত সময় তোমার অনর্থক বরবাদ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।

- কী বলেন এসব! আমি সব সময় ব্যস্ত থাকি। আমার হাতে সময় কই? (তার কণ্ঠে অনুযোগ)

আমি হাল ছেড়ে দিই না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলি।

- তুমি কত সময় রান্নাঘরে কাটাও? আর এই সময়গুলো তোমার কোন কাজে আসে বলো তো?

- রান্নাঘরে গিয়ে আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?

- কাজ করার সময় যদি একটি সুন্দর বয়ানের ক্যাসেট চালিয়ে দাও, তাহলে এই সময়টুকুও তোমার বরবাদ গেল না। এই ফাঁকে কত মাসায়িল ও ফাজায়িল তোমার জানা হয়ে যাবে। আমি তো প্রতিদিন এভাবে এক ঘণ্টা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুনি। তোমার জন্য ক্যাসেট এনে দেয়ার দায়িত্ব আমার। তুমি একটু রাজি হলেই চলবে।

- এটি আর অমন কি কঠিন কাজ হলো। আপনি চাইলে আমি আরও কঠিন কাজ করতে পারি। (তার মুখে মুচকি হাসির আভাস)

- নিরেট অবসর সময়গুলোতে তুমি কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারো। প্রতিদিন কী পরিমাণ শুনবে, তার একটি তালিকা তৈরি করে ফেলো। সেটি প্রতিদিন দশ মিনিট হলেও-বা কম কীসের। কার তিলাওয়াত ভালো লাগে তোমার?

- সিদ্দিক মিনশাবির। শাইখ হুজাইফির তিলাওয়াতও শুনতাম আগে।

- সময়ের মূল্যায়ন যদি করতে পারো, তবে উভয় জাহানে কল্যাণ তোমার পদচুম্বন করবে। সামনে আসছে মাহে রমজান—ইবাদতের মাস, কুরআনের মাস। সকাল থেকেই তো তুমি রান্নাঘরে চলে যাও। দেখো, এত ধরনের খাবার আমাদের চাই না। এক বা দুই প্রকার খানা খেয়েও আমরা সুখে থাকব ইনশাআল্লাহ। তুমি ইবাদতের জন্য সময়কে খালি করো।

আমার স্ত্রীর একটি ভালো দিক হলো, কোনো কিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারলে বেশ খুশি হয়ে মেনে নেয়। আলহামদুলিল্লাহ! এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার চেহারায় দেখা যায় সম্মতির আভাস। এক অজানা প্রশান্তিতে ভরে যায় আমার মন।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সেদিন রাতে কাজ সেরে একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরি। স্ত্রী যথারীতি অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। দুজনেই একসঙ্গে খেতে বসি। খেতে খেতে অনেক খোশগল্প হয় আমাদের। একটি কথা অনেক দিন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার মনে—আমার স্ত্রী বেশ সুন্দর কথা বলে। কথায় কথায় বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা জুড়ে দেয়। সহজেই খুশি করে ফেলে যে কাউকেই। তাই আমাদের বাসায় বাইরের মেয়েদের আনাগোনা একটু বেশি। প্রায়ই দেখি, সপ্তাহের কোনো একটি দিন আমার স্ত্রী অনেক মহিলাকে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কখনো দুয়েক দিন পর পরও দেখি এই দৃশ্য। তাই অবশেষে আজকেই কথাটা পাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কথার ফাঁকে আমি হেসে বলি :

- ওই যে তোমরা প্রতি সপ্তাহে দুয়েক বার মজলিস বসাও—কীসের আলোচনা করো তোমরা?

- পরস্পরের খোঁজ-খবর নিই। বাড়ির অবস্থা জানি। গল্পগুজব করি। এসব আর কি! (একটু সন্দিগ্ধ শোনায় তার কণ্ঠ)

- জানো, তুমি চাইলে কিন্তু এই জমায়েত থেকে অনেক উপকৃত হতে পারো? একটু সতর্ক হলেই তুমি গুনাহর মজলিসকে পরিণত করতে পারো ইবাদতের মজলিসে।

- কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?

- আল্লাহর এই বাণীটি শোনোনি?—(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[৮] আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়—এমনকি আমাদের মুচকি হাসিটুকুও। ইমাম আহমাদ ﵀ থেকেও কথাটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'মানুষকে এই পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হবে যে, অমুক দিন তুমি কেন হেসেছিলে?' তুমি নিশ্চয় খেয়াল করেছ—মজলিস যখন দীর্ঘ হয়, শয়তানও তাতে অংশ নেয়। তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো। চাইলে তুমি এই মহল্লার মহিলাদের দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতে পারো। আল্লাহ তোমাকে অনেক সুন্দর যোগ্যতা দিয়েছেন। তুমি শোকর করলে আল্লাহ নিশ্চয় আরও বাড়িয়ে দেবেন।

---

৮. সুরা কাফ, ৫০ : ১৮।

- আমি পারব? আমার তো তেমন পড়াশোনা নেই! কীভাবে এটি সম্ভব? (তার কণ্ঠে হতাশা)

- অবশ্যই পারবে। পড়াশোনা শুরু করবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে একটু। তাদের বয়স ও অবস্থার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। হিকমাহর সঙ্গে দাওয়াত দিতে হবে। তুমি একটু চেষ্টা করো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। দেখবে, আল্লাহ তোমার সামনে খুলে দেবেন কল্যাণের অফুরন্ত ভান্ডার। শুরু করে দাও। দেখবে সবকিছু সহজ হয়ে এসেছে।

আমার কথা শুনে খানিকটা অস্বস্তির ছায়া ফুটে ওঠে তার অবয়বে। চেহারার কোথাও মলিনতার সামান্য আভাস জেগে উঠে যেন পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড নিচু হয়ে থেকে আবার মাথা উঁচু করে সে। তারপর ধীরে ধীরে বলে :

- আমি একজন মুসলিম নারী। ইস! আপনি যদি কোনোভাবে বুঝতেন, মেয়েদের মজলিসে আমি কখনোই কারও গিবত করি না!

- দেখো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি সত্য বলছ। কিন্তু গিবত শোনা মানে গ্রহণ করা। আর গ্রহণ করা মানে গিবতের অনুমতি ও সম্মতি প্রদান—বরং আমি বলব, গিবতে সাহায্য করা।

আমি পুনরায় তাকে উৎসাহিত করি। নানানভাবে তুলে ধরি দাওয়াতের ফজিলত ও গুরুত্বের কথা। সে যেন তাদের দাওয়াতের ব্যাপারে রাজি হয়। তারপর জিজ্ঞেস করি :

- তুমি কী ভাবছ? যেসব সম্ভাব্য সমস্যার কথা তোমার মনে আসছে, আমাকে খুলে বলো। দুজনে মিলে আলোচনা করলে একটি সুন্দর সমাধান বেরিয়ে আসবে।

- আপনি একটু অতিমাত্রায় আশাবাদী। বিষয়টিকে খুব বেশি সহজভাবে নিচ্ছেন। আপনি মহিলাদের মজলিসের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কাজটি অত সরল নয়—অন্তত যেমনটি আপনি ভাবছেন। তা ছাড়া আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি কীভাবে তাদের সামনে কথা বলব?

- আল্লাহর ওপর ভরসা করো আর অন্তরে সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখো। দাওয়াত ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। কত কিতাব আছে দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে! কত বিষয়ভিত্তিক বয়ান আছে! কোন সমস্যাটির সমাধান নেই বলো তো? তাদের সামনে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারো। প্রথম আলোচনাটা আমি নিজেই তোমাকে প্রস্তুত করে দেবো। তোমাকে শুধু পড়তে হবে। পারবে না?

- ইনশাআল্লাহ! (তার কণ্ঠে সাহসের আভাস)

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ধীরে ধীরে আমার স্ত্রী নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। কীভাবে দাওয়াত শুরু করা যায়—এটিই তার সারাক্ষণের ভাবনা। এর পরের ঘটনা তার মুখেই শুনুন।

'অবশেষে সপ্তাহের সেই দিনটি আসে—যেদিন আমরা জমায়েত হই। মেয়েরা যথারীতি খোশগল্প শুরু করে। আড্ডা-জগতের সবচেয়ে প্রিয় ফল হলো গিবত। ঘুরেফিরে এটিই মজলিসের প্রধান আকর্ষণ। বৈঠকের একপ্রান্তে বসে আমি ভাবতে থাকি। চুপিচুপি আল্লাহর কাছে দোয়া করি সাহায্যের জন্য। দাওয়াতের মোক্ষম একটি উপায় খুঁজে বের করার জন্য ফিকির করতে থাকি। সিদ্ধান্ত নিই, সবাই চলে এলেই তবে কাজ শুরু করব।

আমি নীরবে সবার চোখের দিকে তাকাই। তাদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাদের সঙ্গে কথায় যোগ দিই। গতকাল থেকে আমি ভাবছি, পবিত্র এই আমলের কথা। কত মুবারক এই দাওয়াত। প্রিয়নবি ﷺ এর স্মৃতিবিজড়িত এই মহান কাজ। কত কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি এই বন্ধুর পথে! দীর্ঘ তিন বছর তিনি অবরুদ্ধ ছিলেন পাহাড়ের ঘাঁটিতে। পাথরে পাথরে রক্তাক্ত হয়েছেন তায়েফের মরুতে। প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি থেকে হয়েছেন বিতাড়িত। উহুদের ময়দানে তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁর মুবারক চেহারা—শহিদ হয়েছে তাঁর দাঁত। কত বার যে তাঁকে

হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। তিনি অটল অবিচল। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে যেন তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। কোনো বাধাই কাবু করতে পারেনি তাঁকে। তো আমি যদি দাওয়াত দিই আমার কি এমন কষ্ট হবে? হয়তো কেউ একটু তাচ্ছিল্য করবে কিংবা একটু হাসবে অথবা একটু কটু কথা শুনতে হবে—এটুকু আর কি!

দেখতে দেখতে এক-এক করে সব মহিলাই এসে জমায়েত হয়। আমি সবার সামনে কথা বলার জন্য মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈঠক থেকে উঠে রুমে গিয়ে একটি ছোট কাগজ নিয়ে ফিরে আসি। এটি গতকাল এলাকার মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল। জিলহজ মাসের মাসায়িল ও ফাজায়িল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এতে। একটু গলা খাকারি দিয়ে ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কম্পিত কণ্ঠে বলি :

"আগামীকাল থেকে জিলহজ মাস শুরু হবে। গতকাল মহল্লার মসজিদে এই মাসের মাসায়িল ও ফাজায়িল নিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। আমি সবাইকে সেটি পড়ে শোনাতে চাই।"

আমি ভেবেছিলাম, সবাই আশ্চর্য হয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে ফেলবে। কিন্তু তার কিছুই ঘটল না। ঘোষণা শুনে সবাই মুহূর্তেই চুপ হয়ে যায়। তাদের চোখে-মুখে আগ্রহের ছাপ। আমার ইচ্ছা ছিল খুব তাড়াতাড়ি পড়ে শেষ করব। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে আমি বেশ ধীরে সুস্থে প্রচারপত্রটি পড়ি। পড়া শেষ হলে এক মহিলা আশ্চর্য হয়ে বলে, "এই মাসের এত ফাজায়িল ও মাসায়িল আছে আগে কখনো জানা হয়নি! আমি ভাবতাম, শুধু হজের আমল আছে।"

এরপর আর কোনো কিছুই কঠিন মনে হয়নি। খুব দ্রুত আমি দাওয়াতের পরিবেশ গড়ে তুলি। আমার স্বামীর কথাই সত্য। নিজেকে আমার নিজের চেয়েও বেশি কিছু মনে হয়। দাওয়াতের তৃপ্তিতে ভরে যায় আমার মন। নেক কাজ করার অনুভূতিটুকু আসলেই অপার্থিব। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গে এর তুলনা হয় না। স্বামীকে যখন পুরো অবস্থা তুলে ধরি, খুশিতে

তার চেহারা হাসিতে ভরে যায়। উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি তোমাকে যেমনটি ভাবি, তুমি তার চেয়েও অনেক কল্যাণময়। এখন থেকে আমার স্ত্রী মহল্লার দায়ি (আলহামদুলিল্লাহ)।"

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

দ্বিতীয় সপ্তাহের জন্য খুব দ্রুত আমি সবকিছু গোছাতে শুরু করি। অনেক বই—নির্বাচন করতে গিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিই, তাওহিদ দিয়েই শুরু হবে। এবার আমি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিই। ধারাবাহিক আলোচনার একটি তালিকা তৈরি করি।

এই সপ্তাহে জাদু সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার একটি আলোচনা পড়ে শোনাই। আমি যখন এই হাদিসে এসে পৌঁছাই—(مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) "যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং তার কথাকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদের ওপর নাজিলকৃত শরিয়তের সাথে কুফরি করে।"[৯]—অনেক মহিলা আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলে। অনেকেই বলে, "এটি তো আমরা আগে জানতাম না।" তারা অনেক উৎসাহিত হয়। আমাকেও সাহস দেয়। পরবর্তী বৈঠকে আমি তাহারাত বা পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করি। অধিকাংশ মহিলা দেখি, আকিদার ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। সে হিসেবে তাহারাত ও সালাত নিয়ে তাদের জ্ঞান সন্তোষজনক।

এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আমরা দুবার করে মজলিসের আয়োজন করতে শুরু করি। চলতে থাকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। মহল্লার মেয়েরা আগের চেয়েও বেশি উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ক্রমশ বাড়তে থাকে তাদের সংখ্যা।

একবার আমরা এক দীর্ঘ মজলিসে সমবেত হই। এতে ছোট্ট একটি বই পুরোটা আমি পড়ে শোনাই। মৃত্যুর আলোচনা সম্বলিত বইটি বেশ প্রামাণ্য ও মর্মস্পর্শী। পড়তে পড়তে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। শ্বাসরুদ্ধকর

৯.মুসনাদু আবি দাউদ আত-তয়ালিসি : ৩৮১।

সব আলোচনা। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রাখি—চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে অশ্রু। অবশেষে আর ধরে রাখতে পারি না নিজেকে।

কয়েক মাস এভাবে চলে যায়। আমাদের মজলিসগুলোতে আর গিবত হয় না। জিকির আর তাসবিহ পাঠের ধ্বনিতেই গুঞ্জরিত হয় প্রতিটি জমায়েত। প্রতিটি মেয়েই আপন পরিবারে এবং সমাজে একেকজন দায়ি হিসেবে আবির্ভূত হয়। আমরা আমাদের কর্মপরিধি আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিই। সপ্তাহে একদিন মাগরিবের পরে একটি দরস শুরু করি। অনেক প্রশ্ন এসে জড়ো হয় দরসে। আমি স্বামীর সহায়তায় প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করি। তিনি আমার কর্মতৎপরতায় এতটা অভিভূত হন যে, একদিন এই খুশিতেই আমি কেঁদে ফেলি। সিজদায় লুটিয়ে পড়ি আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ! তোমার পথে ডাকার এত সুখ এত আনন্দ—আমি কোনো দিনও ভাবতে পারিনি।

একদিন স্বামী আমাকে বলেন, "তুমি এই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে আশ্চর্য হয়েছ, তাই না?" আমি বলি, "অনেক আশ্চর্য হয়েছি।" তিনি বলেন, "আসলে সব মানুষই দ্বীনি ফিতরতের ওপর জন্ম নেয়। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের ভুল পথে নিয়ে যায়। যখনই ফিতরতের আহ্বান সে পায়, দ্রুত সাড়া দেয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন করতে দাও—তোমার দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেছে?" আমি দীপ্ত কণ্ঠে বলি, "নাহ! অনেক দায়িত্ব পড়ে আছে সামনে। মহল্লার প্রতিটি মেয়েকেও আমি দায়ি হিসেবে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।" স্বামীর চেহারায় অপার্থিব পুলকের দীপ্তি। তিনি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "শুরু করো কাজ—শুরু করো।"'

মহীয়সী

‘আমরা সামান্য রোদ ছেড়ে ছায়ায় গিয়ে বসি, কিন্তু জাহান্নাম পেরিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করি না।’—আহমাদ বিন হারব ﷺ।

মেহমানে মেহমানে গিজগিজ করছে পুরো বাড়ি। উত্তরের একটি রুমে আমাকে ঘিরে বসেছে বান্ধবী ও আত্মীয়রা। একটু পরপর একেকজন মহিলা আসছে। আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে আর কল্যাণ কামনা করে দোয়া করছে—

‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের উভয়ের কল্যাণ করুন। পরস্পরের মাঝে মিল-মহব্বত দান করুন। নেক সন্তান দান করুন।’

একসময় সবাই চলে যায়। আমি দরোজার দিকে চেয়ে থাকি। মহিলাদের ভিড় কমে এসেছে। একা একা রুমে বসে ডুবে যাই এক অন্তহীন ভাবনায়। জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি। আজকের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করব নতুন এক ভুবনে। হৃদয়জুড়ে দাপাদাপি করছে অদ্ভুত সব কৌতূহল—অজানা সব অস্বস্তি। সহসা স্মৃতির জানালা খুলে অতীতের আকাশে উড়াল দেয় কল্পনার পায়রারা। মন চলে যায় ফেলে আসা সেই শৈশবের আলো-ঝলমলে প্রান্তরে। অন্তরের রুপোলি পর্দায় ভেসে ওঠে আমার হারানো আম্মুর আবছা দৃশ্য—তিনি দোয়া করছেন, ‘আল্লাহ! আমার মেয়েকে পুণ্যবান স্বামী দিয়ো।’ কী মায়াবী মুখ! চাউনিতে কী অদ্ভুত ভালোবাসা!! কথায় সে কি আশ্চর্য মোহময়তা!!!

মা! মা আমার.. কোথায় তুমি?—আজ তুমি নেই আমার পাশে! আর ভাবতে পারি না। কান্নায় ভেঙে পড়ি। স্বপ্নের মতো ঘোর নেমে আসে

আমার চোখে। আমি ফিরে যাই এক যুগ আগের সেই পৃথিবীতে—যেখানে হাসি-আনন্দের দোলায় দুলত আমার শৈশবের দিনগুলো। পাঁচ বছরের ছোট্ট এক মেয়ে আমি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে আম্মুকে খুঁজি। আম্মু... আম্মু... কোথায় তুমি!

ক্রমশ উঁচু হয়ে আসে আমার আওয়াজ। বাসায় অপরিচিত অনেক মুখের আনাগোনা। জনৈক মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসে। তার চোখেও কান্না। আমার হাত ধরে বলেন, 'আম্মু নেই। আম্মু জান্নাতে চলে গেছেন ইনশাআল্লাহ।' আমি কাঁদতে শুরু করি। জান্নাত থেকে কবে আসবেন আম্মু? কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি আমার দিকে ঠায় চেয়ে থাকেন। তারপর চলে যান হাত দিয়ে মুখ ঢেকে। আমার কান্না কবে বন্ধ হয় মনে পড়ে না। তবে মনে আছে, এরপর আমি তিন বছরের ছোট ভাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি। তাকে নিয়ে আবার আম্মুর খুঁজে নামি। বাসায় অনেকেই কাঁদছে—কেউ চেনা আবার কেউ অচেনা। ছোট ভাই হাঁটতে পারছে না। তার হাত ধরে আমি নিয়ে যাই। নিচতলা খুঁজে ওপরের তলায় উঠি। সবগুলো রুমের দরোজায় করাঘাত করি—আম্মু... আম্মু...! কোনো সাড়া নেই। তারপর রান্নাঘরে যাই। সেখানেও নেই। পুরো ঘর খুঁজে দুজনেই ক্লান্ত। এবার বিশ্বাস হয় আমার—আম্মু ঘরে নেই। আমি ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরে আবার কান্না শুরু করি।

ঘণ্টাদুয়েক পর আবার আম্মুর খোঁজে নামি ছোট ভাইয়ের হাত ধরে। এত মহিলা বাসায়! তাদের মাঝে কোথাও নিশ্চয় আড়াল হয়ে আছে। খুঁজে বের করতে হবে। অনেক্ষণ ভেবে হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে আমার মন। একটি জায়গার কথা মনে পড়ে যায়—যেখানে আম্মু প্রায়ই থাকেন। ওই জায়গা তো খুঁজে দেখিনি। ঘরের বাইরে একটি ছায়াদার গাছের নিচে চেয়ার পেতে বসতেন আম্মু। আমি ছোট ভাইকে নিয়ে ওদিকে দৌড়ে যাই। আমার হেঁচকা টানে পড়ে যায় সে। আবার তাকে নিয়ে ছুটি। কিন্তু নাহ! ওখানেও নেই। কেবল গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডালের দিকে তাকাই। আশেপাশে চোখ বুলাই। কোথাও নেই আম্মু। গাছের গোড়ায় বসে আবার কাঁদি। ছোট ভাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

সহসা কাছে কোথাও মানুষের শোরগোল শুনে চমকে উঠি। চোখ তুলে তাকাই। অনেক মানুষ দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। সাদা সাদা পোশাক সবার। সামনের কয়েকজন কাঁধে কী একটা বহন করছে। ছোট ভাই জিজ্ঞেস করে, 'কী নিয়ে যাচ্ছে ওরা?' আমি বলি, 'কোনো ভারী জিনিস। দেখছ না, অনেকেই একসঙ্গে নিয়েছে।' আমরা জানতাম না, ওই ভারী বস্তুটিই আমাদের আম্মু—যাকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা হয়রান।

ধীরে ধীরে কমে আসে লোকজনের ভিড়। থেমে যায় মানুষের শোরগোল। থমথমে এক নৈঃশব্দ্য এসে গ্রাস করে আমাদের বাড়ি। আমি আর আমার ভাই পরম নিশ্চিন্তে খেলতে লেগে যাই সেই গাছের নিচে যেখানে আম্মু বসতেন। এই প্রথম আমরা জুতো ছাড়া এখানে এসেছি। আমার হঠাৎ তৃষ্ণা পায়। কিন্তু কোথাও পানি নেই। একজন মহিলা এসে আমাদের ঘরে নিয়ে যায়।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

পরদিন সকালে উঠে আবার আম্মুর কথা মনে পড়ে। ভাইকে নিয়ে আবার শুরু হয় খোঁজার পালা। আমার ভাই গতকাল কাঁদেনি। আজ কাঁদছে খুব—আম্মু... আম্মু...

একটু পর দাদি এসে আমাদের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেন। তার চোখে কান্না। আমাদের মতো তার চোখও ভেজা। মায়ের মতো কাউকে দেখলেই আমরা ছুটে যাই। ঘ্রাণ নেই। কপালে চুমু খাই—ঠিক যেভাবে আম্মুকে খেতাম। একদিন আমার শিশুমনে আবছা একটি স্মৃতি জেগে ওঠে—আম্মু আমাকে বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'দেখিস তোদের ছেড়ে আমি চলে যাব। আর আসব না কোনো দিন।' সাথে সাথে আরও অনেক স্মৃতি ভিড় জমাতে থাকে মনে। আমরা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি লোহার খাটে আম্মু শুয়ে ছিলেন। আমাকে মাথার পাশে রেখে আব্বু বললেন, 'দেখো, আরওয়া এসেছে।' তারপর ভাইয়াকে খাটে বসালেন। আম্মু আমাকে সজোরে চেপে ধরলেন বুকের সঙ্গে। চুমুর পর চুমু দিয়ে আমার মুখ ভরে তুললেন। এত্ত আদর করলেন। ছোট ভাইকে তো যেন বুকের কোথাও লুকিয়ে ফেলতে

পারলেই তিনি বাঁচেন। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন তিনি। খাট কাঁপতে থাকে তার শরীরের কম্পনে। আব্বু আমাদের কোলে তুলে নিলেন। আম্মুর কণ্ঠে শেষ বাক্য শোনা গেল :

'তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। তিনিই তোমাদের নেগাহবান।'

সাদা পোশাক পরে কিছু মানুষ এসে আমাদের-সহ আব্বুকে বের করে দেয়। আমি আর ছোট ভাই কাঁদতে থাকি। আব্বু স্তম্ভিত। কোনো ভাবান্তর নেই তার চেহারায়। পাথরের মতো জমে আছে তার অবয়ব।

আমি আর ছোট ভাইকে আব্বু পাঠিয়ে দেন নানার বাড়ি। নানির আদরের কোলেই বড় হতে থাকি আমরা। পাঁচ বছর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অবশেষে আমরা ফিরে আসি আবার বাবার কাছে। আব্বুর ঘরে নতুন এক নারী। আমাদের নতুন মা। তিনি আমাদের গ্রহণ করেন পরম আদরে। এত নেককার মেয়েও হয় পৃথিবীতে! আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব তিনি বুঝে নেন। আমাদের সঠিক তরবিয়ত ও শিষ্টাচারের প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি। পড়াশোনার প্রশ্নে কোনো ছাড় নেই। আমাকে কুরআন হিফজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। বেছে বেছে চমৎকার কিছু বান্ধবী জুটিয়ে দেন। সব কাজ এত নিখুঁতভাবে তিনি করেন—আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না। আমাদের কচি মনে তিনি কখনো চোট লাগতে দেন না। আমাদের কোনো আশাই তিনি অপূর্ণ রাখেন না। অনেক সময় আমাদের আচরণে তিনি কষ্ট পান। রেগেও যান কখনো। কিন্তু তার মধুর শাসন ঠিকই আমরা বুঝতে পারি। কত বুদ্ধিমতী আর ধৈর্যশীলা তিনি—ভাবতেই অবাক লাগে। এক মুহূর্ত সময়ও তিনি অহেতুক নষ্ট করেন না। আল্লাহর জিকিরে সব সময় চঞ্চল থাকে তার জবান। দ্বীন ও শিষ্টাচারের এক অপূর্ব সম্মিলন দেখতে পাই তার চরিত্রে। আমাদের জীবনের এক বিশাল শূন্যতা তিনি পূরণ করে দেন তার মাতৃসুলভ সাহচর্যে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আম্মু! আপনি কিন্তু কোনোভাবেই আমার সৎ মা নন। এত ভালো কেন আপনি?' তিনি হেসে বলেন, 'আমি আল্লাহকে ভয়

করি। আমার প্রতিটি কাজের বিনিময়ে সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখি। তোমরা আমার কাছে আমানত। আশ্চর্য হয়ো না—এই যে আমি তোমাদের চুল আঁচড়ে দিই, এতেও আমি সাওয়াব পাব। দেখো, তুমি কুরআন মুখস্থ করেছ। এতে কি আমি বিশাল পুরস্কার পাব না? তোমাদের জন্য আমি যা-ই করি, এর প্রতিদান আল্লাহ আমাকে দেবেন। সালাত, সাওম ও জাকাতের মতো এসব কাজেও নেকি লেখা হয়।' 'কিন্তু অনেক সময় তো আমরা আপনাকে কষ্ট দিই—বিরক্ত করি।' 'আরওয়া! মা আমার! প্রতিটি কাজেই কষ্ট রয়েছে। জান্নাতের একটি মূল্য আছে না? তুমি তো জানো—সিয়াম সাধনায় কষ্ট আছে; হজ করতেও কত কষ্ট সইতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।"[১০]

যেসব সৎ মা ছোট ছোট সন্তানদের অত্যাচার করে, তাদের কি আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না? কত কঠিন হবে তাদের পরিণতি! কী অপরাধ এই নিষ্পাপ শিশুদের? তাদের কেন কষ্ট ভোগ করতে হবে? এই জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে ঘিরে ধরবে জালিমকে।' অনেক্ষণ কথা বলে থামেন তিনি। এত সুন্দর কথা শুনে আমি অবাক হই। এত উত্তম নারীও হয়! আমি বলি, 'আম্মু! আপনাকে পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য হয়েছে। আমাদের এই সৌভাগ্যে আমার আম্মুরও ভাগ আছে। বিদায়ের পূর্বে তিনি আমাদেরকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তার আমানতের যথাযথ হিফাজত করেছেন।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

হঠাৎ বান্ধবী মাইমুনার ডাকে ফিরে আসি স্মৃতির জগৎ থেকে। চোখের পানি মুছে দিয়ে সে আমার ব্যথাতুর চেহারার দিকে নির্বাক চেয়ে থাকে। একটু পরেই আমার সৎ মা কামরায় প্রবেশ করেন। আমি তাকে সালাম

---

১০. সুরা আজ-জিলজাল, ৯৯ : ৭-৮।

করি। জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খাই। তিনি কাঁদছেন। আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে ফেটে যাচ্ছে তার বুক। আমি জানি তিনি আমাকে কত্ত ভালোবাসেন। আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে আমার কণ্ঠ—'আম্মু! মেয়ের জন্য দোয়া করবেন। আপনার কত প্রতিদান যে আল্লাহর কাছে জমা হয়ে আছে—তিনিই ভালো জানেন।' তার মুখে ফুটে ওঠে এক টুকরো উজ্জ্বল হাসি। এই হাদিসটি তো আপনি জানেন :

> إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ
>
> 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমজানের সাওম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, স্বামীর অনুগত থাকে—তাকে বলা হবে, যে দরোজা দিয়ে চাও জান্নাতে চলে যাও।'[১১]

তিনি গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। হাদিসটি শুনে তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের দীপ্তি। মনে মনে বলি, 'আব্বু! তুমি আমাদের জন্য সাক্ষাৎ এক রহমত ঘরে তুলেছিলে। তুমি বড়ই ভাগ্যবান।'

কী হবে এদের?

আমার সুখে আমার দুখে
রবের রিজাই মোর কামনা
আলোর পথেই হোক ব্যয়িত
জীবনের যত সাধনা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ। আমার সাফল্যে সবাই খুশি। কিন্তু আমাকে ছেঁকে ধরে অন্য একটি চিন্তা—এখন আমি কী করব? কোন বিভাগে ভর্তি হব? কোন পথে এগোব? আব্বু-আম্মুও এ ব্যাপারে চিন্তা করেন। চাচাজানের ইচ্ছা আমি কোনোভাবে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত হই। অনেক ভাবি। পুরাতন একটি চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খায়। আমি মেডিকেলে পড়ব—ডাক্তার হব। কিন্তু...? আমি একজন মেয়ে। আমাদের জন্য এই পথ অনেক কঠিন। এখানে আছে হাজারো বাধা-বিপত্তি। আমি ইসতিখারা করি। অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার তো কোনো সমস্যা নেই। কত সুখে আছি আমরা। সৌভাগ্যের কোনো কমতি নেই আমাদের। হাতে টেলিফোন তুলে নিই। শাইখকে সরাসরি প্রশ্ন করি। তিনি বেশ স্পষ্টভাষায় উত্তর দেন—'তোমার যখন সামর্থ্য আছে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও।' তবে তিনি বেশ কঠোর ভঙ্গিতে কিছু শর্ত আরোপ করেন—'শরিয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করা যাবে না। বিশেষ করে পরিপূর্ণ পর্দার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।'

অবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ভর্তি হয়ে যাই মেডিকেলে। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হওয়াই আমার লক্ষ্য। শাইখ আমাকে এই পরামর্শই দিয়েছেন। মুসলিম নারীদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করা ফরজ।

প্রথম বছরটি আমাদের বেশ আনন্দেই কাটে। আমি একা নই—আমার মতো অনেক মেয়ে এখানে। মুসলিম মহিলা ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অনেকেই দেখে। কুরআন হিফজ করাও আমাদের পড়াশোনার অন্তর্ভুক্ত। নিয়মিত ক্লাস হয়। মাঝে মাঝে আয়োজিত হয় সেমিনার। সবকিছুতেই কঠিনভাবে মানা হয় পর্দার বিধান। শরিয়তের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। পড়াশোনার নিবিষ্টতায় কীভাবে যে সময় কেটে যায়—বুঝতেই পারি না। দেখতে দেখতে চলে যায় সাতটি বছর। কত অসাধারণ সব শিক্ষিকার সান্নিধ্যে এসেছি দীর্ঘ এই সময়ে! সম্পর্ক হয়েছে কত বান্ধবীর সঙ্গে। কত মহিলাদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছে। কত শিখেছি কত জেনেছি তার কোনো লেখাজোখা নেই।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আজ আমার জীবনে পরম খুশির দিন। আমি একটি বিশাল হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছি। কাজে যোগ দেয়ার জন্য নিজেকে খুব দ্রুত মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিই। আল্লাহর রহমতে সব ব্যবস্থা দ্রুত হয়ে যায়। একদিন সত্যি সত্যিই বাস্তব হয়ে ওঠে আমার স্বপ্ন। আমি এখন একজন প্রসূতিবিশেষজ্ঞ মুসলিম মহিলা ডাক্তার।

সেদিন জীবনের প্রথম আনন্দঘন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আমার সব ক্লান্তি ও উদ্বেগকে নিমিষে মুছে দিয়ে মায়ের উদর ছেড়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে এক মুসলিম সন্তান। তার কান্নার শব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় আমার সব কষ্ট। মায়ের অপলক দৃষ্টি আটকে থাকে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের চেহারায়। আমি মনে মনে দোয়া করি, 'হে আল্লাহ! তুমি একে কুরআনের সংরক্ষক বানাও—তোমার রাসুলের সুন্নাহর ধারক ও বাহক বানাও।'

তরুণী মা আমার জন্য অনেক দোয়া করেন। কেন যেন মনে হয়, এই হৃদয়-নিংড়ানো দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। দুদিন পরের কথা। যথারীতি আমি তাকে দেখতে যাই। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা

করছি। এমন সময় তিনি আমার হাত ধরে বলেন, 'আমার কোনো মেয়ে হলে তাকে আপনার মতো ডাক্তার বানাব ইনশাআল্লাহ—যাতে মুসলিম মহিলাদের ইজ্জতের হিফাজত করতে পারে। আমার স্বামীও অনেক খুশি হয়েছেন আপনার মতো একজন মহিলা ডাক্তারের হাতে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায়। আপনার জন্য অনেক দোয়া করেছেন।' খুশিতে আমার মন ভরে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! আমার প্রচেষ্টা ও মেহনত তাহলে ব্যর্থ হয়নি। এই তো সবে শুরু হলো। উম্মতের মা'দের আরও অনেক খিদমত করার সুযোগ আমি পাব। আরও অনেক দোয়া আমার ভাগ্যে জুটবে ইনশাআল্লাহ।

আমার দায়িত্ব বেশ কঠিন। প্রায়ই আমাকে রাতেও বেরিয়ে যেতে হয় বাসা থেকে। কখন কোথায় যেতে হয় তার কোনো হিসেব নেই। অনেক কষ্ট ও ঝক্কি পোহাতে হয়। মুমিন মা'দের ইজ্জতের হিফাজতের জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাই। হাসপাতালে চরম অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে সচেষ্ট হই। সব অলসতা ও একঘেয়েমিকে ঝেটিয়ে বিদায় করি। আমি জানি, সবার দোয়া আমার সাথি হবে।

একদিন দায়িত্ব শেষে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরি। ছোট বোন বলে, 'আগামী বৃহস্পতিবার আমার বান্ধবী সাওদার বিয়ে। তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে।' আমি তার সুখী দাম্পত্য জীবন ও নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করি। দুষ্টুমি করে বলি, 'দেখিস, বছর না পেরুতেই তোর বান্ধবী আমার কাছে আসবে।' সাওদার পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ পরিচিতি। বিয়েতে না গেলে সবাই অসন্তুষ্ট হবে। এদিকে আমার হাতে সময় খুব কম। হাসপাতালের দায়িত্বের চাপে সাধারণত কোথাও যাওয়া হয় না আমার। কত দাওয়াত, কত আমন্ত্রণ যে আমাকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে এই দায়িত্বের জন্য তার হিসেব রাখাও দুষ্কর। তবে এই দাওয়াতে না গিয়ে উপায় নেই।

বিয়েতে মহিলাদের ভিড়। সাওদার আম্মুসহ সবার সঙ্গে দেখা করি। আধবয়সী এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি জুয়াইরিয়া?' আমি একটু আশ্চর্য হই—ভদ্র মহিলা আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছেন কেন? আমি বলি, 'নাহ! আমি আরওয়া।' তিনি বলেন, 'ওহ! আমার ভুল হয়েছে। আমি আরওয়ারই খোঁজ করছি। আসলে নামটা ভুলে গিয়েছিলাম আপনার।' তারপর আমার আব্বু-আম্মু কেমন আছেন, কী কাজ করি, দিনকাল কেমন

যাচ্ছে—এই ধরনের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তিনি চলে যান। ফেরার কিছুক্ষণ আগে দেখি, তিনি দূর থেকে আমার দিকে ইশারা করে পাশের মহিলাকে কিছু বলছেন। আমি বুঝতে পারি পুরো বিষয়টি। নিশ্চয় আমার বিয়ে নিয়ে কথা বলছেন তারা। বিয়ের কথাটি ভাবতেই ঝট করে মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। কে জানে, কী হয় অবশেষে! আমার এক বান্ধবীকে সামনে পেয়ে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। সে আমাকে সব জানায়। আমার আন্দাজ ঠিক। পাত্র ও তার পরিবার আমার পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু মনে উঁকি মারে সে পুরাতন আশঙ্কা—'আমি যে ডাক্তার। এটি জানলেই তো তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।' অবশেষে আমার আশঙ্কাই বাস্তব প্রমাণিত হয়। আমি সাহস হারাই না। হয়তো এতে লুকিয়ে আছে কোনো কল্যাণ। আর আল্লাহ তাআলা আমার তাকদিরে যা-ই রেখেছেন তার ওপর আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু তবুও অন্তরে বারবার জেগে ওঠে একটি জিজ্ঞাসা, 'ডাক্তার হয়ে কি আমি ভুল করেছি? শাইখের কথা মানা আমার ঠিক হয়নি?' আমি দ্বীনের জন্য সবকিছু কুরবান করেছি। কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আমি বেছে নিয়েছি—এই দিকটি ভাবলে মনে এক ধরনের সান্ত্বনা পাই।

হাজারো সংকটের মুখেও আমি নিজেকে ধরে রাখি। ভেঙে পড়ি না হতাশায়। তবে এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় অন্তরে খুব ব্যথা পাই। মনে মনে বলি তাকে—'যুবক! আগামী বছরই তুমি স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে আসবে! আমার প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের! আল্লাহর কাছেই আমি পুরস্কারের আশা করি। তবে আমি হাল ছাড়ব না। আমার মা-বোনদের ইজ্জতের হিফাজতের যে তাওফিক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন আমি করব।'

আফসোস তোমাদের জন্য!

এই তোমাদের দ্বীনদারি?

কোথায় নেককাজের উৎসাহ!

কোথায় একটু সাহায্য ও সহমর্মিতা!!

পরিশেষে একটিই প্রশ্ন—কী হবে মুসলিম মেয়েদের? কী হবে তাদের পর্দার? কাদের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি আমরা এদের?

তিলাওয়াত

“

‘মুনাফিকের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা ভারী পাথর বহন করার চেয়েও কঠিন।’—আওস বিন আব্দুল্লাহ ﵀

একে একে বিদায় নিই পরিবারের সবার কাছ থেকে। প্রিয় সন্তান ও স্ত্রীদের ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় ভারী হয়ে আসে বুক। প্রিয় দেশে যাওয়ার আনন্দ ও কৌতূহলও কাজ করছে মনে। এই প্রথম আমি বিমান বন্দরে এসেছি। জীবনের প্রথম আমি বিমানে চড়তে যাচ্ছি। একটু পরেই আমাদের নিয়ে উড়াল দেবে সুদূর আকাশে। আসমান ও জমিনের মাঝখানে আমরা আবিষ্কার করব নিজেদের। ভয়ে দুরুদুরু করে কাঁপবে মন—অনুভূতিগুলো ছুটবে দিগ্বিদিক।

এয়ারপোর্টে বসে বসে নানা জল্পনা-কল্পনা ভিড় করে আমার মনে। ওই দেশে কেমন হবে আমার জীবন? কীরূপ হবে আমার কাজগুলো? সহসা আবছা একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে কল্পনার পর্দায়—‘শুভ্র ইহরাম জড়িয়ে আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছি।’ বিষয়টি ভাবতেই যেন মনে কেউ সুধা বর্ষণ করে। এক অদ্ভুত ভালো লাগার আবেশে ভরে যায় বুক। শুধু এই স্বপ্ন পূরণের জন্য হলেও আমি বেছে নেব প্রবাস জীবন—সহ্য করব শত কষ্ট। এবার নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত মনে হয়। হঠাৎ একটি ঘোষণা শুনে কেটে যায় ভাবনার জাল। আমাদের পাসপোর্ট এসে গেছে। সফরের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ। এক কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনার পেশা কী? বকরি চরানো?’ আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি। অবশেষে বিমানে চড়ে বসি আমরা। ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যায় নিচের পৃথিবী। খানিক পরেই আমরা পৌঁছে যাই মেঘের রাজ্যে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

বিমান বন্দর থেকে বেরোতেই দেখা হয়ে যায় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যার কাজ করার জন্য আমি এখানে এসেছি। স্মিতহাস্যে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান। ব্যগ্র হয়ে জানতে চান, 'সবকিছু ঠিক আছে? কোনো সমস্যা হয়নি তো কোথাও?' আমি তাকে আশ্বস্ত করি। ঘরে এনে তিনি একে একে প্রশ্ন করতে থাকেন। 'কত বছর বকরি চরিয়েছ তুমি? ছাগলের রোগব্যাধি সম্পর্কে জানাশোনা আছে তো?' সফরের ক্লান্তিতে আমার দুচোখ বুজে আসে। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আসে উপদেশ পর্ব। 'বকরিগুলো একেবারে দূরে ছেড়ে দিয়ো না। আবার পর্যাপ্ত ঘাস নেই এমন জায়গায়ও আটকে রেখো না। সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রেখো।'

পরের দিন তিনি আমাকে লোকালয় থেকে বহু দূরের মরুভূমিতে নিয়ে যান। এবড়ো-থেবড়ো পাথুরে প্রান্তর বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমরা। বকরি চরানোর স্থানে যখন পৌঁছাই তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। একটি উঁচু টিলার ওপর ছোট্ট একটি তাঁবু। আজ থেকে এখানেই আমাকে থাকতে হবে। দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তর দেখে আমার মন কেমন যেন আকুল হয়ে ওঠে। চারদিকে সৌম্য শান্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ। পরিপাটি তাঁবুটির একপাশে আমার থাকার ব্যবস্থা। অপর পাশে বকরির খাদ্যের গুদাম। রান্নাবান্নার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

রাতে গাঢ় ঘুম হয় আমার। ভোরে সূর্য ওঠার আগেই জেগে উঠি। দ্রুত ফজরের সালাতের প্রস্তুতি নিই। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আমার কর্মব্যস্ততা। বকরির পালের দিকে তাকাই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করি। তারপর রওনা দিই চারণভূমির দিকে। সাথে দুপুরের খাবার। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চলতে থাকে আমার উট। আমি দোয়া পড়ি :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾

'পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা নিশ্চয় প্রত্যাবর্তন করব আমাদের পালনকর্তার দিকে।' [১২]

---

১২. সুরা আজ-জুখরুফ ৪৩ : ১৩-১৪।

পাল পাল বকরির দৌড়ে ধুলো ওড়ে মরুপ্রান্তরে। খরখর একটানা একটি ধ্বনি শোনা যায় সম্মিলিত খুরাঘাতের। মরুর অনেক গহীনে চলে যাই আমি। পেছনের তাঁবু ক্রমশ ছোট হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়। ফিরে আসব সেই সূর্যাস্তের সময়।

উপযুক্ত একটি প্রান্তর দেখে থামি। খিদেয় পেট জ্বলছে। খাওয়ার পর্বটা সেরে নিলে ভালো হবে। এদিকে জোহরের সালাতের সময় ঘনিয়ে আসে। উঁচু একটি টিলায় চড়ে আজান দিই। কাছে কোথাও মৃদু প্রতিধ্বনিত হয় আজানের শব্দ। একটু দূরেই চড়ে বেড়াচ্ছে আমার বকরিগুলো। ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করে নিই। জায়নামাজে বসে মনে পড়ে আমার গ্রামের মসজিদের কথা। কয়েকদিন আগেও আমি সেখানে সালাত আদায় করেছি। আজ আমি কোথায়?

বিজন এই মরুপ্রান্তরে নিঃসঙ্গ এক রাখাল আমি। বসে বসে কী করব এখানে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। হঠাৎ মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে কুরআন হিফজের কথা। আব্বুর কথাগুলো এখনো কানে বাজে—তিনি আমাকে কুরআন হিফজ করার অসিয়ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সময়কে হেলায় নষ্ট করো না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করো।' এখন আমার পাশে তো কেউ নেই। কার সঙ্গে কথা বলব আমি। মনে মনে আব্বুর অসিয়ত পূর্ণ করার অঙ্গীকার করি। ইনশাআল্লাহ! আমি কুরআন হিফজ শুরু করব। এই অভাবিত সুযোগ ও অফুরন্ত অবসর পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

কী সুন্দর ব্যবস্থা আল্লাহ আমার জন্য করে রেখেছেন! এখানে জীবন বড়ই সরল নির্ঝঞ্ঝাট। নেই কোনো ব্যস্ততার উৎপাত কিংবা মানুষের কোলাহল। গিবত নেই, পরনিন্দা নেই, চুগলখোরি নেই, বিশৃঙ্খলা নেই—সবকিছু পরিষ্কার ঝকঝকে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সাঁঝের বেলা যখন তাঁবুতে ফিরে আসি মাগরিবের সালাতের সময় হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি অজু করে দাঁড়িয়ে যাই জায়নামাজে। তারপর কুরআন

তিলাওয়াত করতে বসি। ইশার সালাত আদায় করে রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি। শেষ রাতে কিয়ামুল লাইলের জন্য জাগতে হবে। এভাবে কাটতে থাকে আমার দিন। জুমার দিন আমি শহরের কাছাকাছি একটি মসজিদে চলে আসি জুমার সালাত আদায় করার জন্য। ওই দিন আমার কাজের মালিকের সঙ্গেও দেখা হয়। তাকে বলি, 'আমার এই দেশে আসার অন্যতম লক্ষ্য বাইতুল্লাহর জিয়ারত।' তিনি বলেন, 'সে ঢের দেরি। আরও কয়েক মাস আছে। তুমি কাজ চালিয়ে যাও।'

সকালে আমি কুরআনের নির্দিষ্ট একটি অংশ মুখস্থ করি। সারাদিন সেটি আওড়াতে থাকি। মাগরিবের সালাতের পর নির্দিষ্ট একটি অংশ হিফজ করি। সেটি ঘুমানোর আগ পর্যন্ত বারবার পড়তে থাকি। বৃহস্পতিবার ও জুমাবার দিন পুরো সপ্তাহের হিফজ করা অংশগুলো পুনরায় যাচাই করি।

আমার তাঁবু থেকে মাইলচারেক উত্তরে আরেক রাখাল থাকে। কখনো কখনো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। বিশেষ করে জুমার দিন আমরা একই মসজিদে নামাজ পড়ি। একবার সে আমার তাঁবুতে আসে। আমার অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'তোমার কোনো রেডিও বা টেলিভিশন নেই? তুমি পত্রিকাও পড়ো না? কীভাবে সময় কাটাও? দুনিয়ার কোনো কিছুরই খবর দেখি তুমি রাখো না।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'দেখি, তুমি কী কী করো আমাকে বলো। আপন সময় থেকে তুমি নিজে কতটুকু উপকৃত হচ্ছ?' প্রশ্ন শুনে সে সোজা হয়ে বসে। 'আমার কাজ কম। অবসর বেশি। বকরি রোগাক্রান্ত হলে সেবা করা এবং কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করা ছাড়া আমার বিশেষ কোনো কাজ নেই। এগুলোই কাজ আমার ছোট্ট জীবনে। কখনো কখনো বকরি বাচ্চা দেয়। এটি হলো আমার জন্য অনেক বড় ঘটনা।' আমি বলি, 'হয়েছে এবার থামো। এই হলো গিয়ে তোমার কাজকর্ম। আচ্ছা বলো তো—তুমি সর্বশেষ কুরআন পড়েছ কবে?' প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে সে। আমি তাকে আমার দিনগুলো কীভাবে কাটে তা খুলে বলি। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'তোমার জীবনই উত্তম। তোমার বকরিও উত্তম আমাদের বকরির চেয়ে। আমি তাঁবুতে গিয়েই রেডিওটা ছুঁড়ে ফেলব। আগামীকাল থেকে পরিপূর্ণভাবে কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করব ইনশাআল্লাহ।'

সাদাকা

“

আবু ইসহাক তাবারি ﷺ বলেন, ‘নাজ্জাদ ﷺ দীর্ঘ দিন ধরে সাওম পালন করতেন। রাতে ইফতার করতেন কেবল একটি রুটি দিয়ে এবং সেখান থেকে এক টুকরো রেখে দিতেন। জুমার রাত তিনি ওই জমানো টুকরোগুলো দিয়ে ইফতার সারতেন এবং সেদিনের রুটিটি সাদাকা করতেন।’

আমার সহকর্মী কথা বলে হিসেবি ভাষায়। তাকে তুমি যা-ই জিজ্ঞেস করো প্রথমে হিসেব করবে। যোগ-বিয়োগ করে তারপর তোমাকে ফলাফল শোনাবে। একবার আমরা দুজন রাতে ঘুরতে বের হই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিঃশব্দে হাঁটি আমরা। মরুর বুকে দাঁড়িয়ে তারাভরা ঝলমলে আকাশ দেখে মনটা কেমন প্রশান্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞেস করে :

- প্রতি বছর আপনি কী পরিমাণ সম্পদ দান করেন?
- কেন জিজ্ঞেস করছেন? (আমার কণ্ঠে অস্বস্তি)
- বলুন না—কত সম্পদ দান করেন?
- এসব নিয়ে কী করবেন? তা ছাড়া আপনি তো জানেন, দানের কথা গোপন করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ওই সাত ব্যক্তির অন্যতম হলো সেই লোক, যে গোপনে দান করে—এমনকি তার বাম হাত জানে না, ডান হাত কী দান করেছে।’

সে যে হিসেবি ভাষায় কথা বলে তা জানতাম। কিন্তু এতটা নাছোড়বান্দা যে তা জানতাম না। সে আমাকে একই প্রশ্ন আবার করে। বাধ্য হয়ে আমি ভাবতে শুরু করি—এক বছরে আসলে আমি কত দান করি। বিগত দিন, মাস ও বছরগুলোর ওপর নজর বুলাই। বিষয়টি বেশ বিদঘুটে মনে হয়। একটু অস্বস্তি লাগে—এটি আবার কেউ হিসেব করে নাকি! আমার চিন্তা দীর্ঘ হতে দেখে সে বলে :

- চলুন! আরও সহজ প্রশ্ন করি। আমরা এখন চলতি মাসের মাঝামাঝি অবস্থান করছি। নতুন চাঁদের দুই সপ্তাহ আমরা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে এসেছি। আজ চোদ্দো তারিখ। এই মাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কত টাকা দান করেছেন?

- নাহ! এই চোদ্দো দিনে কিছুই দান করিনি। (আমার স্পষ্ট তড়িৎ জবাব)

সে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলায়—যেন সে উত্তরটি আগে থেকেই জানত। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবার হিসেবে ফিরে যায়। বিড়বিড় করে বলে :

- তার মানে দাঁড়াল এই কয়দিনে আপনি কিছুই দান করেননি—একটি খেজুরও না। আপনি কেবল ফকির দেখলেই দান করেন, তাই না?

- হাঁ। আপনি ঠিক বলেছেন।

- আপনি কখন ফকির দেখতে পান? কখন ফকিরের খোঁজ করেন? অবশ্য আমি কেবল ফকিরের কথা বলছি না—আপনার গরিব আত্মীয় ও প্রতিবেশীরাও এতে আছে।

আমি মনে মনে বলি, আমি কোনো ফকিরেরও খোঁজ করি না, কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীরও না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলতে থাকে—'আপনি যদি প্রতিদিন এক রিয়াল করে দান করেন, তাহলে এক বছরে আপনার মোট ৩৬৫ রিয়াল দান করা হবে। কী বিশাল এক অঙ্ক তাই না?' এই বলে সে সম্মতির জন্য আমার দিকে তাকায়। আমি বলি, 'হাঁ! আপনার কথা সঠিক।' মনে মনে ভাবি, পুরো বছরেও তো আমার ৩৬৫ রিয়াল দান করা হয় না। বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর ভাবনায় ডুবে যাই।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

দান-সাদাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অনাহারীরা খাবার পায়, বস্ত্রহীনের কাপড়ের ব্যবস্থা হয়, অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানের আলো দেখে আর অভাবীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সম্পদ দান করেছেন। আপনার মাসিক বেতন তিন হাজার রিয়ালের চেয়েও বেশি। আপনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কী খিদমত পেশ করেছেন?

আপনি কি আপনার ভাই, বন্ধু বা প্রতিবেশীর জন্য কোনো কিতাব কিনেছেন?

আপনি কি সামান্য পয়সা দিয়ে হলেও কোনো মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন?

কয়টি ইসলামি ক্যাসেট আপনি উপহার দিয়েছেন?

কয়জন অভাবীর দিকে আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন?

কল্যাণের পরিসর অনেক বিস্তৃত অনেক পরিব্যাপ্ত। কিন্তু কীভাবে যেন আমরা নেক আমল থেকে দূরে সরে থাকি—বঞ্চিত হই সাওয়াব থেকে।

আপনি কেন প্রতি মাসে দান করার জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করবেন না? আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশগুলো কেন গরিবরা পাবে না? আপনি হয়তো ভাবছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু আমার কীই-বা আছে! তাহলে শুনুন—

পরিবারের খাদ্যের পেছনে আপনার প্রতিদিন যত ব্যয় হয় সেখান থেকে মাত্র এক রিয়াল বাঁচিয়ে আপনি অনাহারক্লিষ্ট কোনো পরিবারের মুখে হাসি ফুটাতে পারেন—যারা এক দিন কি দুদিন ধরে না খেয়ে আছে।

প্রতি বছর প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি জামা কেনার টাকাও যদি আপনি সঞ্চয় করেন, তাহলে আকিদাসংক্রান্ত অনেকগুলো কিতাব আপনি বিভিন্ন মাদরাসায় দান করতে পারবেন।

আপনার স্ত্রী যদি দ্বীনদার হন এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভের আশায় প্রতি বছর প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কামিজ কেনা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে ইসলামি বয়ানের অনেকগুলো ক্যাসেট আপনি বিতরণ করতে পারবেন।

আপনি কত শান্তিতে বাস করছেন। কিছু মুসলিম দেশ আছে যেগুলোতে কোনো শান্তি নেই—কাফিরদের সঙ্গে সংঘাত লেগেই থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের সহায় হোন। আপনি চাইলে তাদের কাছেও সাহায্য পাঠাতে পারেন।

আপনি কত ধরনের দামি দামি আসবাবপত্র দিয়ে আপনার ঘর সাজান। ওখান থেকে দুয়েকটি বাদ দিলেও তো আপনার অনেক অর্থ সাশ্রয় হয়—যা দিয়ে আপনি অন্তত তিনজন মাদরাসা-ছাত্রের এক বছরের পড়ার খরচ যোগাতে পারবেন। আল্লাহু আকবার! ভেবে দেখুন, একটু সতর্ক হলেই কত কল্যাণ লুটিয়ে পড়বে আপনার পায়ে! আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করুন। নিজেকে রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না।

আল্লাহর রাস্তায় আপনি যা-ই দান করবেন, আল্লাহ আপনাকে তার চেয়েও উত্তম বদলা দেবেন। কত মানুষের দোয়ায় আপনার নাম উচ্চারিত হবে! কুরআন-পড়ুয়া অনাথ শিশুদের নিষ্পাপ হাসি সজীব করে তুলবে আপনার জীবনকে।

আপনার সন্তানকেও শরিক করুন এই কল্যাণে। তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও খেলাধুলার জন্য যেসব জিনিস কিনতে হয়, সেখান থেকে তাকেও সঞ্চয় করতে বলুন। তাকে বুঝিয়ে বললে দেখবেন, সেও খুশি মনে দ্বীনের জন্য অর্থ সঞ্চয় করবে। যা দিয়ে সে কোনো ইসলামি ম্যাগাজিন মানুষকে বিলি করবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা আজ নির্যাতিত। কোথাও চলছে দুর্ভিক্ষ। বসতবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে বাস করছে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা—মোটকথা সব ধরনের মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। উম্মাহর এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের ভোগ-বিলাসে টাকা ওড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। দেশের ভেতরেই আমাদের ভাইদের জীবন বিপন্ন।

একটু আন্তরিক হলেই আমরা এরকম হাজারো কল্যাণের সুযোগ কাজে লাগাতে পারি। সামান্য মেহনতেই শরিক হতে পারি উম্মাহর বৃহত্তর খিদমতে।

মুজাহিদ

‘তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়, দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি—মুমিনের অজেয় হিম্মত ও দুঃসাহসের মূল উৎস।’

স্মৃতির পর্দায় আজও স্পষ্ট দেখতে পাই অসাধারণ প্রাণবন্ত সেই যুবককে। প্রত্যয়দীপ্ত চেহারা। প্রশস্ত ললাটে তার সৌভাগ্যের দ্যুতি। এক টুকরো হাসি সর্বদাই ঝুলে থাকে ঠোঁটে। তার সুউচ্চ সাহস যেন পাল্লা দেয় আসমানের মেঘের সাথে। দ্বীনের জন্য সে তার মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছিল—এমন একটি সময়, যখন মানুষ সামান্য টাকা খরচ করতেও কার্পণ্য করছিল।

প্রয়োজনীয় সবকিছুই এই যুবকের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তার সাহস, শক্তি ও দৃঢ়তা সবাইকে মুগ্ধ করত। ভীতিকর পরিস্থিতিতেও সে থাকত অটল অবিচল। সবাই যখন বিচলিত উৎকণ্ঠিত—তার চেহারায় স্বস্তি ও দৃঢ়তার ছাপ দেখে কেউ অবাক না হয়ে পারত না। সবাই যখন পিছু হটার চিন্তায় বিভোর সে সামনে এগানোর স্বপ্নে উদ্দীপ্ত। কত ফিতনা কত পরীক্ষা গেল তার ওপর দিয়ে! কিন্তু সে নির্বিকার। অন্তরজুড়ে একটিই স্বপ্ন—আল্লাহর দ্বীন একদিন বিজয়ী হবে আল্লাহর জমিনে। পার্থিব কোনো সাফল্যে কিংবা দুনিয়ার কোনো চাকচিক্যে তার মোটেও আগ্রহ নেই। ইসলামের কল্যাণই তার সাধনা—দ্বীনের ভবিষ্যতই তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

যৌবনের প্রারম্ভে সেই যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল আর রাখেনি। পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটিয়েছে বছরের পর বছর। চিতার মতো ক্ষীপ্র তার গতি। বাজের মতো তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। একবার জিহাদের ভূমি থেকে দেশে

এসেছিল সে। এত্ত খুশি হয়েছিলাম তার আগমনের খবর পেয়ে। সবকিছু ফেলে ছুটে গিয়েছিলাম। আবেগে বুক ভারী হয়ে এসেছিল তাকে দেখে। আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদের সাক্ষাতে নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হয়েছিল। সেদিন তাকে আফসোস করে বলতে শুনেছি, 'আহা! আল্লাহ এখনো আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিলেন না। চাইলেই কি আর হয়—সৌভাগ্যবান না হলে এই নিয়ামত কেউ পায় না!' আশ্চর্য হলাম তার শাহাদাতের তামান্না দেখে। তার ইমানের সজীবতা যেন আমাকেও ছুঁয়ে গেল। আসরের সালাতের পর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আলিমের সঙ্গে একটি কক্ষে আলোচনায় বসল। আমরা সবাই আগ্রহভরে জিহাদের কারগুজারি শুনছিলাম। সে একের পর এক ঘটনা শোনাতে থাকে—

'একবার আমরা এক গ্রামে কিতাব বিতরণ করতে যাই। তাওহিদ, আকিদা ও ফিকহ-সংক্রান্ত কিতাব। গ্রামের লোকদের কিতাব বিতরণ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। ঝামেলা হলো, কিতাব পড়ানোর মতো উপযুক্ত কোনো আলিম খুঁজে পাওয়া। বিকেলের দিকে আমাদের কাজ শেষ হয়। আমরা তখন একটি পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়। হঠাৎ গ্রামের লোকজন এসে খবর দেয়, দুশমন বোধহয় আপনাদের খবর পেয়ে গেছে। মহল্লার উত্তর প্রান্তে বোম্বিং শুরু হয়েছে। আমাদের কাছে তখন বিমানবিধ্বংসী ভারী অস্ত্র ছিল না। কারণ আমরা তখন অপারেশনে ছিলাম না। আমরা গিয়েছিলাম কিতাব বিতরণ করতে। হাতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কিছু পুরাতন ক্লাসিনকোভ। মুহূর্তেই চারদিকে নেমে আসে সুনসান নীরবতা। জঙ্গী বিমানের আওয়াজ ক্রমশ নিকটে আসতে থাকে। আমরা দ্রুত মাটি খুঁড়ে তৈরি পাহাড়ি বাংকারে গিয়ে আশ্রয় নিই। সবাই কালিমা পড়তে থাকে। কেউ কেউ কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে।

বিমানের কানফাটা গর্জনে কিছুই শোানা যায় না আর। বুম-ম-ম... বুম-ম-ম... বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যায়। আমরা বেরিয়ে আসি বাংকার থেকে। কারণ আমরা বুঝতে পারি, আমরা এখানে নিরাপদ। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশের ছোট্ট গ্রামগুলোর দিকে তাকাই। বিশ বিশটি ঘর নিয়ে একেকটি গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামের ঘরের সংখ্যা হয়তো আরও বেশি। পাথর দিয়ে তৈরি ঘরগুলো বেশ সুন্দর। কাছের একটি গ্রাম

থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমি চোখে দুরবিন লাগিয়ে দেখি। কঠিন এক দৃশ্য ফুটে উঠে আমার চোখে। অবর্ণনীয় সেই দৃশ্য। বোমার বিস্ফোরণে দুলে উঠছে পায়ের নিচের মাটি। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠছে। আমার মনে পড়ে যায় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সেই হাদিসটি। এক সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কবরে সকল মুসলমানেরই আজাব হবে, কিন্তু শহিদের আজাব কেন হবে না? তিনি বললেন,

كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً

'তার আজাবের জন্য মাথার ওপর তলোয়ারের চমকই যথেষ্ট।'[১৩]

মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে জঙ্গী বিমান। কিছুক্ষণ পর পর পেট থেকে বেরিয়ে আসছে বিশাল বোমা। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ। বিস্ফোরণের তীব্রতায় থরথর করে কেঁপে উঠছে পাহাড়। কোথায় দেশের সেই ভোগ-বিলাসে ঘেরা আরামের জীবন—আর কোথায় এই মৃত্যুর খেলা! পদে পদে এখানে ওত পেতে আছে বিপদ। ঘাড়ের ওপর মওতের খড়গ ঝুলে আছে চব্বিশটি ঘণ্টা। জীবন আর মৃত্যু এখানে চলে হাত ধরাধরি করে। আশ্চর্যের কী আছে এতে! এই তো মুমিনের জীবন। তারা তো বহু পূর্বেই আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছে—জান-মাল সবকিছুর বিনিময়ে জান্নাতের সওদা করেছে তারা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন—তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে।'[১৪]

এখানকার ঘটনাগুলো যেন খুব দ্রুত ঘটে যায়। মৃত্যু এখানে জীবনের চেয়েও স্বাভাবিক। মনের অজান্তেই আমরা তাকবির দিয়ে উঠি। জোরে জোরে কালিমা পড়ি। মনে হয়, এই আমার জীবনের শেষ তাকবির—জীবনের শেষ শাহাদাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। পাশের

---

১৩. সুনানুন নাসায়ি : ২০৫৩।

১৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।

গ্রামে এখনো বম্বিং হচ্ছে। ধোঁয়া আর ধুলোবালিতে একাকার হয়ে আছে আসমান আর জমিন। গ্রামের পূর্ব পাশে ছোট্ট একটি ঘর। দুই কি তিন রুমের বেশি হবে না। গ্রামের অন্যান্য বাড়ি থেকে একটু দূরে পাহাড়ের পাদদেশে। বিস্ফোরণের শব্দে থরথর করে কাঁপছে পুরো গ্রাম। চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে বাড়িঘর। হঠাৎ ওই ঘর থেকে এক মহিলা ছুটে বেরোয়। গায়ে বোরকা নেই। পায়ে জুতো নেই। উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যাবে? কিছুক্ষণ বামদিকে ছোটে আবার ডান দিকে দৌড়ায়। একটু পর তার ছোট মেয়েটিও তার সাথে মিলিত হয়। বয়স এখনো বোধহয় পাঁচ পেরোয়নি। আতঙ্কে পড়িমরি করে ছুটছে মা আর মেয়ে। হঠাৎ একটি পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় ছোট্ট মেয়েটি।

ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যায় জঙ্গী বিমানের শব্দ। আমরা নেমে আসি পাহাড় থেকে। ধোঁয়া ও ধুলোবালি পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। চিৎকার চেঁচামেচিও ক্রমশ কমে আসছে। আমার মনে বারবার ঘুরপাক খায় একটি আয়াত—

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾

'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাদের সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।'[১৫]

নতুন জীবন

জীবনের মায়াবী তেপান্তরে
মরণের আঁধার ঘনিয়ে আসে
প্রস্তুতি আছে কি তোমার হে মুসাফির?
মাটিতে রচিত হবে শয্যা তোমার
চিরতরে তুমি হারিয়ে যাবে
কবরের নিকষ আঁধারে।

প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত কেটে যায় সময়। কাউন্ট ডাউন শুরু হয় আমার বিয়ের। দিন যত কাছে আসছে, আমার দায়িত্ব ও ব্যস্ততা বেড়েই চলেছে। নানান জল্পনা-কল্পনা ভিড় করছে মনের কোনে। আমি ঠিক করেছিলাম, এক মাস পূর্বেই সব কাজ গুছিয়ে আনব। আসলে কাজ অত বেশি ছিল না। অত দীর্ঘ সময় নেয়ার প্রয়োজনও ছিল না। আমি সবকিছু করছিলাম একেবারে ধীরে সুস্থে। শুধু বাসর ঘরের কার্পেট চয়েস করতে আমি এক সপ্তাহ সময় নষ্ট করি। রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে আরও এক সপ্তাহ।

এখন সব কাজ শেষ। হাতে আরও সপ্তাহখানেক সময় বাকি। সব ঝামেলা চুকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি বারবার। অন্তরজুড়ে দোল খায় মধুর এক প্রতীক্ষা। পুষ্পিত হয়ে ওঠে হৃদয়ের স্বপ্নগুলো। নতুন এই জীবনের কথা ভাবতেই যেন সুধা বর্ষিত হয় মনের আঙিনায়। তারুণ্যের নিরঙ্কুশ কল্পনায় ঝলমল করে ওঠে আমার দিনগুলো। রাতের প্রহরগুলো কাটে

স্বপ্নের ঘোরে। কখনো চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। একান্ত নির্জন সময়গুলোও মধুর হয়ে ওঠে। ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে বসে শান্ত বিকেলগুলো পার করি। পা-দুটো যতটুকু পারা যায় ছড়িয়ে শরীরের সবটুকু ভার ছেড়ে দিই। পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে পাল্টে দেখি। বিয়ে সম্পর্কে যত কলাম আছে খুঁজে খুঁজে পড়তে থাকি। ভবিষ্যৎ সন্তানদের নিয়েও সাজাই নানান পরিকল্পনা। হঠাৎ চমৎকার এক শিরোনামে চোখ আটকে যায়—'আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছেন?' আমি মনে মনে খুশি হই—এই সপ্তাহের পত্রিকাগুলোতে দেখি প্রায়ই আমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে! আমি গভীর আগ্রহে পড়তে থাকি। বিবাহেচ্ছুদের জন্য নানান পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। হঠাৎ একটি পরামর্শে চোখ আটকে যায়—'বিয়ের পূর্বেই একবার শরীর পরীক্ষা করান।' আমি আবার পড়ি প্যারাটা। বিয়ের পূর্বে শরীর পরীক্ষা করানোর উপকারিতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। দুদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে থাকি। এই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। অবশেষে আমি পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিই।

শরীর চেকআপের প্রথম ধাপ ছিল রক্ত পরীক্ষা। আনুষ্ঠানিকতা শেষে তারা আমাকে নির্দিষ্ট রুমে নিয়ে গিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে। তিন দিন পর রিপোর্টের জন্য যোগাযোগ করতে বলে। বিয়ে নিয়ে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরি। রিপোর্ট নেয়ার সময় হলে আমার ওপর অলসতা ভর করে। গড়িমসি করতে শুরু করি। কী হবে এসব চেকআপ-টেকআপ করে! সবাই তো এসব ছাড়াই বিয়ে করে ফেলে। আবার মনে হয়—আরে পরীক্ষার পুরো খরচই তো জমা দিয়ে দিয়েছি। খামোখা রিপোর্টটা না এনে টাকাগুলো নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তৃতীয় দিন নির্দিষ্ট সময় থেকে বেশ দেরি করে আমি ঘর থেকে বের হই। তারপরও হাসপাতালে পৌঁছে আমাকে আরও আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় রিপোর্টের জন্য। অবশেষে আমার ডাক আসে ডাক্তারের রুমে। আমি ধীর পায়ে গিয়ে তার সামনের চেয়ারে বসি। আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে পাশে রাখা একটি ফাইল থেকে তিনি রিপোর্টের কাগজগুলো বের করেন। খানিকটা পড়ে আবার পৃষ্ঠা উল্টান। আমি তার দিকে তাকাই।

হঠাৎ তার চেহারায় একটি বিস্ময়ের ভাব উদয় হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। এলোমেলোভাবে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে তিনি আড় চোখে আমাকে দেখেন। আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারিনি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, 'স্যার! কোনো সমস্যা?' তিনি হাতের কাগজগুলো টেবিলে রাখেন। তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই বলে ফেলেন, 'আপনার শরীরে ক্যান্সারের আলামত পাওয়া গেছে!' ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। চকিতে কথা বলতেও যেন ভুলে যাই। বোবা দৃষ্টি মেলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাই। আমার অশ্রু টলমল চোখে হাজারো জিজ্ঞাসা। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করি, 'কীভাবে ডাক্তার সাহেব?' তিনি স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠে বলেন, 'এটি নিছক আলামত। আমাকে আবার পরীক্ষা করতে দিন।' আকস্মিক এই বজ্রপাতে আমি নড়াচড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলি। তিনি বুঝতে পারেন—কথাটি এভাবে সরাসরি পাড়া ঠিক হয়নি। আমি জোরে জোরে নিশ্বাস নিই—নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করি আমি সত্যিই বেঁচে আছি কি না। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পেটা করছে কেউ। ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে একটানা। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'আরে এত ভারী কিছু না। সাধারণ একটি ব্যাপার। আমরা পরীক্ষাটা আবার করব।'

অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম—যাচ্ছি বুকভরা দুঃখ ও বেদনা নিয়ে। মুহূর্তেই কত কিছু ঘটে গেল! হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি উদভ্রান্ত হয়ে যাই। কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারি না। গাড়িতে হেলান দিয়ে আমি চোখ বন্ধ করি। মনে মনে বলি, এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করাই আমার কাজ। ভাবতে ভাবতে মনটা কেমন যেন মরে যায়। অর্থহীন মনে হয় চারপাশের সবকিছু। পরিবারের কথা ভাবি। তাদের গিয়ে কী বলব? যদি দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও একই রিপোর্ট আসে তাহলে? কী করব আমি—চুপ করে থাকব, নাকি তাদের জানাব? দ্রুত আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—বিয়ে করব কি করব না।

পুরো রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ঘুম কি জিনিস যেন ভুলেই যাই। সকালে সব কাজকর্ম ছেড়ে হাসপাতালে রওনা হই। আবার রক্তের নমুনা নেয় তারা। আমি বলি, 'একটু বেশি করে নিন—যাতে নিশ্চিত হওয়া

যায়।' মনে হয়, আমার শিরায় রক্ত বলতে কিছুই আর বাকি নেই—চিন্তা আর হতাশা ছাড়া। কখনো ভাবি, আরে এটি ডাক্তারদের ভুল ছিল। পরক্ষণেই কে যেন বলে ওঠে—এটিই সত্যি।

ঘরে আমার মন বসে না। বাইরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াই। বিকেলে গরম চায়ের জগ ফেলে বেরিয়েছিলাম একটু পর ফিরব বলে। সেই যে বেরিয়েছি বাসায় ফিরেছি রাত সাড়ে এগারোটায়। নিজেকে মনে হয় পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখি—যে খাঁচায় ছটফট করছে মুক্ত আকাশের স্বপ্নে।

কেউ আমাকে দেখলেই বলে, 'তোমার এই অবস্থা কেন? একজন হবু বরের এই চেহারা হয় কীভাবে? এখন থেকে ভয় পেতে শুরু করলে?' আমার আর তাদের চিন্তার মাঝে কত ফারাক! তিন দিন আমার অনেক দীর্ঘ মনে হয়। সংশয় দূর করতে আমি আরেকজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। একই দিন আবার প্রথম ডাক্তারের সঙ্গেও ফোনে কথা বলি। নাহ! রিপোর্ট আসবে আগামী পরশু। আমি বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুনি। সব ধরনের কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। যাদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, তাদের ফোন করে নিষেধ করে দিই। অবশিষ্ট কিছু কেনাকাটা ছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। আমি আর কাউকে দেখতে চাই না। পৃথিবীর দিকে তাকাই একজন বিদায়ী মুসাফিরের দৃষ্টিতে। আম্মুর কাছ থেকে চেহারা লুকিয়ে রাখি। কল্পনায় আমি দেখি—আম্মুকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে আর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। আব্বুর কথা মনে পড়তেই মন আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগেও বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন।

তৃতীয় দিন আমি কেমন যেন শান্ত হয়ে যাই। আমি সিদ্ধান্ত নিই, যদি নিশ্চিতভাবে ক্যান্সার ধরা পড়ে, তাহলে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু পরক্ষণেই হায়াতের তামান্না আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। এই ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে কত মানুষই তো বেঁচে আছে। আর হায়াত তো আল্লাহ তাআলার হাতে।

ভোর সাতটার সময় আমি ডাক্তারের চেম্বারের সামনে গিয়ে উপস্থিত। হয়তো ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি আসবেন। তিনি আসেন এক ঘণ্টা পর। রিপোর্ট আসে আরও দুই ঘণ্টা পর। এই তিন ঘণ্টা সময় আমার কাছে তিন বছরের চেয়েও দীর্ঘ মনে হয়। রিপোর্ট আসার খবর পেতেই আমি ছুটে যাই। ডাক্তার সাহেব রিপোর্টের ফাইলটি হাতে নেন। আমি ভয়ে কাঁপতে শুরু করি। অবশ হয়ে আসে আমার হাত-পা। বুকের ধুকধুক শব্দটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সবকিছু ঝাপসা মনে হয় আমার কাছে। চেয়ারে বসেই এক ধরনের ঘোরে চলে যাই আমি। উদভ্রান্তের মতো ঠায় চেয়ে থাকি ডাক্তারের হাতের ফাইলটির দিকে। তিনি রিপোর্ট পড়ছেন। এক সেকেন্ড...দুই সেকেন্ড...তিন সেকেন্ড... আমি শ্বাসরুদ্ধ করে বসে থাকি। অবশেষে সুসংবাদটি শোনান তিনি। আলহামদুলিল্লাহ! নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। নিজের অজান্তেই আমি চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি। সিটে ফিরে এসে বলি, 'আপনি আবার একটু পড়ে দেখুন। আমাকে একটু শান্ত করুন।'

আমার খুশির কোনো সীমা নেই। পৃথিবীর সবকিছু আমার নতুন মনে হয়। যাকেই দেখছি সালাম দিচ্ছি শুধু। হাসপাতালের বিপরীত পাশেই মসজিদ। আমি পাগলের মতো ছুটে রাস্তা পার হই। অজু করে দুরাকাত সালাত আদায় করি। প্রাণভরে সিজদা করি আমার মহান মালিককে—যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তারপর গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটি। আম্মুকে সালাম দিতেই চোখাচোখি হয়ে যায় মা আর সন্তানের। তিনি অবাক হন। আমার খুশি যেন সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে। নিশ্বাস ওঠানামা করছে খুব দ্রুত। আম্মু বলেন, 'কী হয়েছে তোর?' আম্মুর সামনে গিয়ে আরাম করে বসি। আম্মু আমার অবস্থা দেখে মুখ টিপে হাসেন। 'এত খুশির কী হয়েছে আমাকে বলবি না!' আম্মু! বলার জন্যই তো ছুটে এসেছি.... ।'

বড় ভাইয়া খুব করে বকেন আমাকে। 'তোর এত বড় সমস্যা ধরা পড়ল—আর তুই আমাদের বলার প্রয়োজনও বোধ করলি না! আমরা তোর কেউ না?' বড় ভাইয়াকে কারও ওপর এতটা রাগতে কোনো দিন দেখিনি। এত বকা কীভাবে একজন মানুষ অনর্গল দিতে পারে। আমি নীরবে শুনি।

আমার করারই-বা কী আছে আর। একটু পর তিনি শান্ত হয়ে আসেন। তারপর একটু কী যেন ভাবেন। অতঃপর তিনি নসিহতের স্বরে বলেন—

'আদম-সন্তান দুর্বল হতে পারে—কিন্তু তেজ ও অহংকারের কমতি নেই। বড়াইয়ের কারণেই তার পতন হয়। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু আমল করতে সচেষ্ট হয় না। সুস্থতা ও নিরাপত্তা পেয়ে মানুষ খুশি হয়। কিন্তু এই দুটিকে কাজে লাগিয়ে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে না। আর তুমি? তুমি তো নতুন জীবন পেয়েছ! তোমার হাতে সুযোগ আছে। জীবনের হিসেবটা এই বেলা চুকিয়ে নাও... ।'

নববর্ষ

“

‘আগামীকাল তাওবা করবে বলে বসে থেকো না। কারণ তুমি জানো না আগামীকালের সূর্যোদয় তুমি দেখবে কি না। বিভোর হয়ো না দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশায়। অনন্ত জীবনের পাথেয় আজই গুছিয়ে নাও। হতে পারে আজই তোমার জীবনের শেষ দিন।’

মাগরিবের সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে ফিরেই দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটির সামনে এসে দাঁড়াই। আজানের সময় চাঁদ দেখেছি। নতুন হিজরি বর্ষ শুরু হয়েছে। মহররমের এক তারিখ আজ। ক্যালেন্ডারের সর্বশেষ পৃষ্ঠাটি উল্টাই। দেখতে দেখতে একটি বছর যে কীভাবে ফুরিয়ে গেল বুঝতেই পারি না। জীবন তো কতিপয় বছরেরই সমষ্টি। একটি বছর চলে যাওয়া মানে কবরের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। আজ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হলো একটি বছরের। আমার এক বছরের আমলনামা আজ ভাঁজ করে রেখে দেয়া হবে। সংরক্ষণ করে রাখা হবে কিয়ামত দিবসের জন্য। জানি না কী কী লেখা হয়েছে আমার আমলনামায়।

প্রতিটি শুরুরই সমাপ্তি আছে। প্রতিটি পথেরই শেষ আছে। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করেছেন। কত সাথিকে আমরা হারিয়েছি। কত মৃতকে আমরা দাফন করেছি এই দিনগুলোতে। নতুন বছরে আমরা পদার্পণ করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

হে আমার জীবনসাথি!

এসো, নতুন বছরের এই শুভলগ্নে আমরা নতুন করে অঙ্গীকার করি।

চলো, আমরা আমাদের শক্তিকে একত্রিত করি। আমাদের সাহসকে উদ্দীপ্ত করি। নতুন বছরের প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা কাজে লাগাব। একটি সেকেন্ডকেও আমরা অহেতুক নষ্ট হতে দেবো না। বিগত বছরের কত সময় আমরা বরবাদ করেছি। ইবাদতের কত সুযোগ আমরা হারিয়েছি। সেই সময় ও সুযোগগুলো আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। চিরদিনের জন্য আমরা হারিয়েছি এই দিনগুলো। একটি মুহূর্তকেও চাইলে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না। অথচ এই সময়গুলোতে কত তাসবিহ আমরা পড়তে পারতাম। কত তিলাওয়াত আমরা করতে পারতাম। কত সালাত আমরা আদায় করতে পারতাম। যদি একটু ভেবে দেখো—হাজারো সময় তুমি এমন পাবে যেগুলো আমাদের কোনো কাজে আসেনি। অনর্থক নষ্ট হয়েছে। ইস! আমরা যদি একটু সতর্ক হতাম!

সবকিছু ফিরিয়ে আনা যায়—কিন্তু সময়কে ফেরানোর কোনো সুযোগ নেই। চলো, আমরা নিজেদের আমলগুলোর একটু হিসেব নিই।

নতুন এই বছরে আমাদের প্রতিদিনের হিসেব নিতে হবে। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে আরও মনোযোগী হতে হবে। বলো তো—আগামী বছর আমরা কোথায় থাকব?

আমরা জানি, কবর আমাদের গন্তব্য। সময় আমাদের পুঁজি। খুব দ্রুতই আমরা জিজ্ঞাসিত হব আমাদের জীবন সম্পর্কে।

নতুন এই বছরে আমরা খুবই সতর্ক থাকব। অলসতাকে বিদায় জানাব চিরদিনের জন্য। উদ্যমই হবে আমাদের সর্বক্ষণের সাথি। ফরজ সালাত ও সাওম আদায় করেই আমরা ক্ষান্ত হব না—নফলেও মনোনিবেশ করব। দান-সাদাকায় আমরা আরও উদার হব।

পূর্বের সকল গুনাহ থেকে আমরা আজই তাওবা করছি। যখনই কোনো গুনাহ হয়, তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নেব। সব ধরনের নাফরমানি থেকে আমরা নিজেদের পবিত্র রাখব।

নতুন এই বছর আমাদের জন্য বয়ে আনুক কল্যাণের নতুন পয়গাম...

মুসাফির

“

‘কবরের কাছে এসে সমান হয়ে যায় সবাই। কে রাজা কে প্রজা কোনো ফারাক নেই। সবার একই অবস্থা, একই পরিণতি। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আর কত দৃষ্টান্ত চাই আমাদের?’

সকাল থেকেই গভীর পেরেশানিতে ডুবে আছে মন। চেহারায় ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর হতাশার ছাপ। এর বিশেষ কোনো কারণও খুঁজে পাই না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় গতকাল বিকেলের কথা। সহপাঠী ও শৈশবের বন্ধুরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। মতবিনিময় করেছিলাম আমাদের জীবন নিয়ে—আমাদের কাজ নিয়ে। সহপাঠী ও বন্ধুদের অধিকাংশই সম্পদশালী। ইচ্ছেমতো খরচ করে। জীবনকে উপভোগ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সবাই। কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। আমার মনে হলো, আমার অবস্থাই সবার চেয়ে খারাপ। হয়তো এই কারণেই আমার মন বিষণ্ন হয়ে আছে।

আজ আসরের সালাতের পর আব্দুর রহমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। সে গতকাল আড্ডায় আসতে পারেনি। কী একটা জরুরি কাজ ছিল তার। আব্দুর রহমান অত্যন্ত নম্র ভদ্র ও অমায়িক চরিত্রের এক যুবক। কথা বলে বেশ রসিক ভঙ্গিতে। উপস্থিত যুক্তিতে তার জুড়ি নেই। যেকোনো কথা যে কাউকেই সে বুঝিয়ে বলতে পারে। সবার মনে ঈর্ষা জাগে এই চটপটে তরুণকে দেখে। মনে মনে ভাবি, তার সঙ্গে দেখা হলে হয়তো বিষণ্নতা কেটে যাবে।

আসরের আগে থেকেই আমি বাড়ির সদর দরোজার পাশে ঘুরঘুর করি। চোখ রাখি রাস্তার ওপর। একটু পরেই আব্দুর রহমান আসবে। অবশেষে

তাকে আসতে দেখা যায়। চোখাচোখি হতেই সে অনেকটা যেন ছুটে আসে। দীর্ঘক্ষণ বুকের সাথে চেপে রাখে আমাকে। কথা বলতে গিয়ে আমার বিষণ্ণতা তার চোখে ধরা পড়ে যায়। সে প্রশ্ন করতে শুরু করে। 'বল তো কী হয়েছে তোর? মন খারাপ করার মতো কিছু ঘটেছে?' আব্দুর রহমান আমার বেশ ভালো বন্ধু। আমার সবকিছু তাকে শেয়ার করি। গতকালের ব্যাপারটি তাকে খুলে বলি। সে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ! যে নিয়ামতে তুই ডুবে আছিস তার জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে খানিকটা তিরস্কারের স্বরে বলে, 'তুই অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করছিস—যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। ইসলামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত তুই লাভ করেছিস। তোর অবস্থা সেই যুবকের মতো যে জনৈক বুজুর্গ আলিমের কাছে এসে নিজের দুরবস্থার অভিযোগ করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন :

- তোমার চোখদুটো আমাকে এক লক্ষ টাকায় দিয়ে দেবে?
- নাহ।
- তোমার কানদুটো দেবে এক লক্ষ টাকায়?
- নাহ।
- তোমার হাতদুটো?
- নাহ।
- আমি দেখছি, তোমার কোটি কোটি টাকার সম্পদ আছে। আর তুমি জীবন নিয়ে অভিযোগ করছ?'

তার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলি—'আলহামদুলিল্লাহ'। সে এবার তার আসল কথাটা পাড়ে। 'তুই কীভাবে অন্তরে দুঃখ আর সংকীর্ণতাকে জায়গা দিস? পুরো একটি দিন তুই বিষণ্ন মনে বসে আছিস!

সালাত ও তিলাওয়াত থেকে তুই কত দূরে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন দ্রুত সালাতে মনোনিবেশ করতেন।

কোনো দিন তো পত্রিকা পড়া মিস হয় না। কোনো মাসের ম্যাগাজিন পড়া তো তোর বাদ যায় না।

তোর রবের কিতাব পড়ার কোনো আগ্রহ কি আছে?

কুরআনের সাথে তোর কী সম্পর্ক?

কীভাবে তোর হৃদয়ের ময়লাগুলো দূর হবে? কীভাবে তুই সুন্দর একটি জীবন কামনা করিস? সালাত থেকে দূরে থেকে? কুরআনকে পর করে?'

তার কথাগুলো আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। প্রশ্নগুলো আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলে :

- চল বের হই।

- কোথায় যাব?

- এখন জিজ্ঞেস করিস না। যেতে যেতে তো বুঝতে পারবি কোথায় যাচ্ছি।

- আচ্ছা চল।

ড্রাইভিং করতে করতে সে আমাকে বলে, 'এই যে আরামদায়ক গাড়ি—এটিও আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়া যায় নিশ্চিন্তে। তুই মুসলমানদের সাথে মুসলিম দেশে থাকার সুযোগ পেয়েছিস—এর জন্য কি কখনো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিস? দৈনিক পাঁচবার তুই শুনতে পাস সাফল্যের আহ্বান। সন্তানদের তাওহিদের শিক্ষায় বড় করতে পারছিস। দ্বীনি মাদরাসায় পড়ানোর সুযোগ পাচ্ছিস....'

বড় রাস্তায় উঠে মিনিটদশেক চালিয়ে হঠাৎ ডানের একটি মোড়ে চলতে শুরু করে সে। আমি বলি :

- এটি তো কবরস্থান রোড! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? একটু পরেই তো কবরস্থান!

- একটু সবুর কর। এত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? এত ভয় পাওয়ার কী আছে? মানুষের কাঁধে চড়ে আসার পূর্বে নিজের পায়ে হেঁটে একবার আসতে

দে না আমাকে। এটিই আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান। আগেভাগে একটু দেখে নিই।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন কবরবাসীগণ! আর নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে আমরা শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব।'

দোয়া পড়ে আমরা বিশাল কবরস্থানটির দিকে তাকাই। বৃক্ষহীন উন্মুক্ত খোলা ময়দান। চারদিকে কেমন ভীতিকর নির্জনতা। সারি সারি কবরে শুয়ে আছে কত মানুষ। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সবাই এক কাতারে। ধনী-গরিব কিংবা রাজা-প্রজার কোনো ভেদাভেদ নেই। কোথাও শুয়ে আছে বিলাসী রাজপুত্র। কোথাও বৃদ্ধ মুহাদ্দিস। কোথাও বিশাল অট্টালিকার মালিক। আর ওদিকে পড়ে আছে আরও অনেক খালি কবরের জায়গা—যেগুলো নতুন কোনো বাসিন্দার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। হঠাৎ আব্দুর রহমানের কথায় ভাবনায় ছেদ পড়ে—'এই কবরগুলোর ব্যাপারে তুই কী ভাবছিস?' আমি চুপ করে থাকি। সে বলে, 'এটি আমলের সিন্দুক। আমাদের দ্বিতীয় বাসস্থান। চলো, ওই নতুন খনন করা কবরটাতে নামি। আজকেই হয়তো কাউকে দাফন করা হবে এখানে।' 'নাহ! আমি নামতে পারব না।' ভয়ে আমি কয়েক পা পিছিয়ে আসি। কিন্তু আব্দুর রহমান ধীর পায়ে ওই কবরে গিয়ে নামে। বিসমিল্লাহ বলে কবরে শুয়ে পড়ে। সে বলে, 'দুনিয়া কত তুচ্ছ। এটি আমার দ্বিতীয় বাসস্থান। হে আল্লাহ! আমার কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিয়ো।' শুয়ে পড়ায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু পর তার কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যায়—

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[১৬]

---

১৬. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৫।

'অবশ্যই আমরা তোমার নিকট ফিরে যাব হে আল্লাহ! অবশ্যই ফিরে যাব...।' সে বারবার একই কথা আওড়াতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে আসে আর আমাকে বলে, 'একটু করে কবরে নাম—তোর সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।' 'নাহ! আমার ভয় লাগে। আমি পারব না।' সে বলে, 'কী বলিস এসব। নাম একবার নাম—নেমে দেখ।' তার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে আমি নামি। ওপর থেকে আব্দুর রহমানের কণ্ঠ শোনা যায়—'আব্দুল্লাহ! মনে কর তুই মরে গেছিস। তোকে দাফন করা হয়েছে।' কবরে শুয়ে আমার কেবল দুটি বিষয় মাথায় ঘুরপাক খায়—দুনিয়ার তুচ্ছতা আর দীর্ঘ প্রত্যাশার অসারতা। আমরা সবাই চলে যাব সবকিছু ছেড়ে—কেবল আমলই আমাদের সাথি হবে।
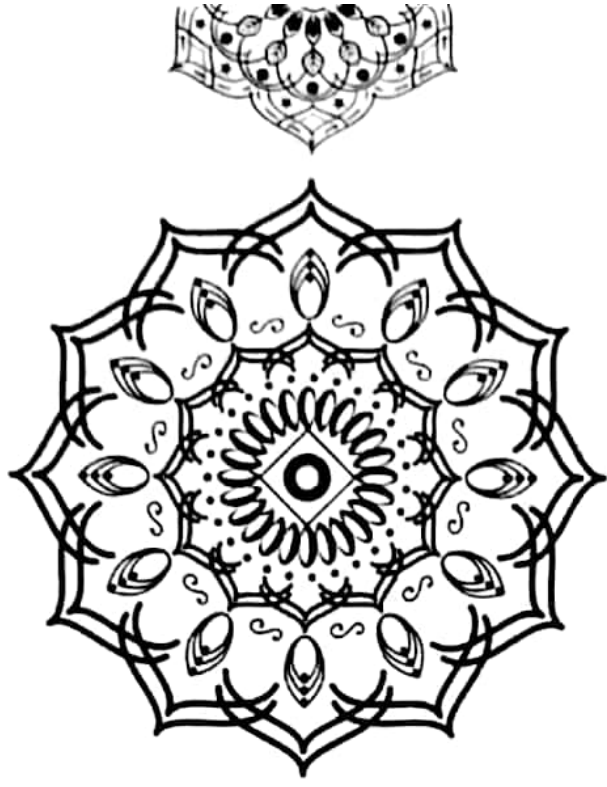
স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে

তৃতীয় খণ্ড

সূচিপত্র

বিদায়

"

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আমি পদব্রজে বাইতুল্লাহর সফর করার আগে আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত করতে লজ্জা পাই।' বিশবার তিনি মদিনা থেকে পায়ে হেঁটে আল্লাহর ঘর জিয়ারত করেন।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

জোরে জোরে তালবিয়া পড়তে পড়তে তাওয়াফের ভঙ্গিতে তিনি আমাকে হেঁটে দেখান। ফরজ হজ আদায়ের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন—'কীসের অপেক্ষায় আছ? আর কত দেরি করবে? দেখো, প্রতি বছর একবারই আসে এই সুযোগ। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এই হজ। তোমার গড়িমসি করার কারণ কী? এখন যোগাযোগব্যবস্থা কত সহজ! পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে আরামে হজ করে আসা যায়। তুমি কি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদিস শোনোনি—(الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ) "মকবুল হজের প্রতিদান কেবল জান্নাত।"[১৭] হজ তোমার অন্তরকে সাহস ও প্রত্যয়ে ভরে দেবে। খুশি ও আনন্দে ভরে তুলবে তোমার দিনগুলো।'

আমি ভাবতে থাকি। ব্যস্ততাগুলো সারি সারি পাহাড়ের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনেক সমস্যা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। আমাকে চুপ থাকতে দেখে তিনি আবার উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলতে শুরু করেন, 'সুযোগ বারবার আসে না। ইতস্তত করার কোনো দরকার নেই।' আমি বলি, 'এত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? একটু অপেক্ষা করুন। আমাকে একটু ভাবতে

১৭. মুসনাদু আহমাদ : ৭৩৫৪।

দিন। কীভাবে যাব? থাকব কোথায়?' স্রোতের মতো প্রশ্ন আসতে থাকে একের পর এক। কীভাবে হজ করব? কত ভিড় সেখানে! প্রচণ্ড গরম পড়ছে এই বছর। আবার হাজির সংখ্যাও বেশি। তিনি স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'আরে এটি কোনো ব্যাপার না। সবকিছু আল্লাহ সহজ করে দেবেন।'

সত্যি সত্যি আল্লাহ তাআলা সবকিছু সহজ করে দেন। ব্যস্ততার পাহাড়গুলো চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে যায় হঠাৎ। ঝামেলাগুলোও কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে। আমি তার সঙ্গে বাইতুল্লাহর সফরে যাওয়ার জন্য রাজি হয়ে যাই। ইবাদতের সফরে স্বামীর চেয়ে উত্তম সাথি আর কে হতে পারে?

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আমাদের বিয়ের তিন বছর কেটে গেল। এই দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আল্লাহর ইবাদতে একে অপরের সহযোগী। তিনি কোনো কিছু ভুলে গেলে আমি স্মরণ করিয়ে দিই, আমার কোনো ত্রুটি হলে তিনি সতর্ক করেন।

আমাদের বিয়ের শুরুর দিনগুলোর কথা। একবার তার হাতে একটি ছোট কেঁচি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করি—

- এটি দিয়ে কী করবেন?
- অতিরিক্ত দাড়িগুলো কাটব। (এই বলে তিনি মুখে হাত দিয়ে হাসি লুকালেন)
- কেন? এগুলো কাটতে হবে কেন? (আমার কণ্ঠে বিস্ময়)
- তোমার চোখে যাতে আমাকে ভালো দেখায়।
- আমার ভালো লাগার জন্য আপনি গুনাহ করবেন?

অত্যন্ত উত্তম স্বভাবের মানুষ। সাথে সাথেই তিনি তাওবা করেন। এরপর তিনি আর কখনো দাড়ি কাটার জন্য কেঁচি হাতে নেননি।

আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে আমরা বাইতুল্লাহর সফরে বের হই। পিতা যেমন ছোট মেয়ের হাত ধরে রাখে, তিনি সারাটা সময় আমার হাত ধরে রাখেন। আমার সব কাজ তিনি আগ বেড়ে করে দেন। তার কণ্ঠস্বর কত মনকাড়া! সব সময় তিনি জিকিরে মশগুল।

লাখো হাজিদের পদচারণায় গমগম করছে তাঁবুগুলো। চারদিকে অজানা এক প্রশান্তি। প্রতিদিন মাগরিবের পর বয়ান হয়। তিনটি দিন কেটে যায় দোয়া ও ইসতিগফারে। এখানে রাত-দিনের কোনো পার্থক্য নেই। হাজিদের তালবিয়া ছাড়া যেন কিছুই শোনা যায় না। মক্কার পাহাড় আর উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয় সেই মধুর আওয়াজ।

মধ্যরাত্রিতে সেখানে আরও জোরেশোরে উচ্চকিত হয় তালবিয়ার আওয়াজ। তাকবিরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে পবিত্র কাবা চত্বর। তিনি আমাকে বলেন, 'আজ মধ্যরাত্রিতে আমরা তাওয়াফ করব।' তাওয়াফের প্রতি তার আকুল আগ্রহ দেখে আমি বিস্মিত হই। আমিও রাজি হয়ে যাই।

গভীর রাতে যথারীতি আমরা মাতাফে গিয়ে হাজির হই। আমি তখন গর্ভবতী। তিনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যান। আমাকে বলেন, 'দেখো! ধীরে ধীরে তাওয়াফ করবে। খুব বেশি যেন ক্লান্ত না হয়ে যাও। আমরা একসাথে আজ নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করব।'

আমরা হজের আমলগুলো আদায় করতে থাকি। অবশেষে ফুরিয়ে আসে সময়। আজ আমাদের মক্কায় শেষ দিন। রাতে তাওয়াফে বিদা করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিই। তাওয়াফ শেষে প্রাণভরে দোয়া করি দয়াময়ের দরবারে—'আল্লাহ! তোমার ঘরের এই জিয়ারত যেন আমাদের শেষ জিয়ারত না হয়।' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আমার মনে পড়ে গতকালের শাইখের বয়ান। তিনি হজের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদিসটি বলেছিলেন :

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

'যে ব্যক্তি হজ আদায় করে এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।'[১৮]

আমি খুশিতে তাকবির দিয়ে উঠি—আল্লাহু আকবার! সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সব ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই পুণ্যময় আমলের

১৮. সহিহুল বুখারি : ১৮২০।

তাওফিক আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! হৃদয় উজাড় করে দোয়া করি—'তিনি যেন আমাদের হজকে কবুল করেন।' বাইতুল্লাহর পবিত্র দৃশ্য দেখে দেখে আমি হৃদয়কে শান্ত করি। বিদায়ী তাওয়াফ করতে গিয়ে মনটা হুহু করে কেঁদে ওঠে। আবার আসতে পারব তো এই মুবারক ইবাদতে শরিক হতে! আবার দেখা হবে তো বাইতুল্লাহর সঙ্গে! বারবার বাইতুল্লাহর দিকে তাকাই। চোখ যেন ভরে না—আশ যেন মেটে না। আবার কি পারব সাফা-মারওয়ার সায়ি করতে! জমজমের পারে দাঁড়িয়ে আবার কি পান করার তাওফিক হবে! দুচোখে অশ্রুর বান ডাকে। হে বাইতুল্লাহ! আজ ছেড়ে যাব তোমায়।

আমরা জিদ্দা বিমান বন্দরের দিকে রওনা হই। চারদিকে লোকজনের ভিড়। দলে দলে হাজিরা বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে। আশ্চর্য এক নীরবতায় ছেয়ে আছে চারদিক। সবার চোখে বেদনার ছায়া। হাতে ব্যাগ নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে, কবে তারা বাড়ির উদ্দেশে উড়াল দেবে। আমরা একটি বড় কাফেলায় ছিলাম। তাই আমাদের অনেকেই বিমানে সিট পায়নি। তারা পরবর্তী বিমানে আসবে। আমার স্বামীও পাননি। রিয়াদ বিমান বন্দরে পৌঁছে আমরা পেছনে পড়া লোকদের জন্য অপেক্ষা করি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর খবর আসে পরবর্তী ফ্লাইট এসে পৌঁছেছে। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আগত লোকদের মাঝে আমি স্বামীকে খুঁজি। আশ্চর্য! সবাই এসেছে কিন্তু আমার স্বামী নেই। এক হাজি মক্কায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এসে আমাকে বলেন, 'আপনার স্বামী আসতে আরও দেরি হবে।' তার কথাগুলো কেমন জড়ানো মনে হয়। ইশারায় সে বলে, 'এখানে অপেক্ষা করার চেয়ে ঘরে চলে যাওয়াই আমার জন্য উত্তম।' মনে মনে বলি, 'কী হলো? শুধু একা তিনি কেন পেছনে রয়ে গেলেন?'

উপায়ান্তর না দেখে আমি ঘরে চলে আসি। সেদিনই কে একজন আমাকে টেলিফোন করে বলে, 'আপনার স্বামী অসুস্থ। খুব ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। হজের পর এমনটা অনেকের হয়ে থাকে। এক হাজি ভাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন।' সবগুলো খবর আসছে টেলিফোনে। তাও আবার বেশ দেরিতে। কথাগুলো কেমন যেন বিশৃঙ্খল আর ভাঙা ভাঙা।

আমার মনে উঁকি দেয় নানান আশঙ্কা। নিশ্চয় বড়সড় কোনো ঝামেলা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই আমার সঙ্গে মৃত্যুর আলোচনা করছেন। সবরের কথা বলছেন। এসব শুনে আমার আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়। এরা হঠাৎ আমাকে এসব শোনাচ্ছে কেন?

সেদিন বিকেলের কথা। এক ব্যক্তিত্ববান বৃদ্ধ লোক আমাদের ঘরে আসে। তার বয়স সত্তরের কম হবে না। আজানু প্রলম্বিত সফেদ জুব্বা। হাতে লাঠি। তিনি আমাকে সালাম করেন। জানতে চান, আমি কেমন আছি? তারপর যেন ফিসফিস করে বলেন, 'তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। আমরা যা কিছু পাই আল্লাহই দেন। আর যা হারাই তিনিই নিয়ে যান। সবকিছুর জন্য তিনি একটি সীমা ঠিক করে দিয়েছেন। তুমি এই দোয়া করো—"হে আল্লাহ! আপনি মুসিবতে আমার সহায় হোন। আপনি যা নিয়ে নেন, তার চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান করুন।"' তার কণ্ঠস্বর আরও নিচু হয়ে যায়। তিনি ধীরে ধীরে বলেন, 'আব্দুল্লাহ মারা গেছে।' সহসা আমার বুকজুড়ে নেমে আসে সন্ধ্যার আঁধার। আমি মুখে হাত দিয়ে উচ্ছ্বাসিত ভাবাবেগ রোধ করার চেষ্টা করি। চোখদুটো অনবরত বইতে শুরু করে। আমার হাতে এখনো লেগে আছে তার গন্ধ। ব্যাগে এখনো আছে তার কলম, জামা ও কাগজপত্র—এমনকি ইহরামের কাপড়টাও।

হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পাগলের মতো আমি ঘরময় ঘুরে বেড়াই। ওখানে পড়ে আছে তার জুতো জোড়া। হ্যাঙ্গারে ঝুলছে তার জুব্বাগুলো। বারবার কানে গুঞ্জরিত হয় তার সুমধুর কথামালা। ওখানে পড়ে আছে তার জায়নামাজ। সেখানে তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। দেয়ালে ঝুলছে তার ক্যালেন্ডার যেটি তিনি প্রতিদিন দেখতেন আর বলতেন, 'দেখো, আমাদের সময়গুলো কীভাবে কেটে যাচ্ছে। সময় জীবনেরই অপর নাম।' প্রতিটি জায়গায় তার কোনো না কোনো চিহ্ন পড়ে আছে। প্রতিটি প্রসঙ্গেই মনে পড়ে তার কথা।

কত অশ্রু ঝরাই সবার অগোচরে! কত দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে! কত সময় কেটে যায় বিরহের যন্ত্রণায়! একদিন পেটের সন্তানটি পৃথিবীতে আসে। তার চেহারায় বাপের আদল দেখে বুকটা কেমন চিনচিন

করে ওঠে। সালাতের পরে আমি প্রতিদিন দোয়া করে যাই—'হে আল্লাহ! তুমি আমার স্বামীকে ক্ষমা করো। তার ভুলত্রুটি মাফ করে দাও। তাকে জান্নাতের নিয়ামত দান করো।' তিনটি বছর আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি। এত মধুর জীবন হয়তো আর কখনো পাব না।

প্রতিদিন আমি তাওবা করি। দুনিয়াকে আমার আর চেনার বাকি নেই। আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। দোয়া করি, আল্লাহ যেন জান্নাতে আমাদের আবার মিলিয়ে দেন। যে মিলনের পর আর কোনো দিন আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। যে সুখের পর আর কোনো দুঃখ নেই।

স্বামীর সুন্দর মৃত্যুতে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। কাবা চত্বরেই তার জানাজা হয়। কাবার কাছেই রাখা হয় তার খাটিয়া। আল্লাহ তাআলা তার হজকে কবুল করুন। তার সকল গুনাহ ক্ষমা করুন।

অধৈর্য হয়ো না

“

আহমাদ বিন আসিম ﷺ বলেন, ‘আজই সুবর্ণ সুযোগ। নিজেকে শুধরে নাও—বাকি জীবনকে পরিশুদ্ধ করো। আল্লাহ তাআলা তোমার অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।’

আমি তখন আচ্ছন্ন ছিলাম গাফিলতির মরণ ঘুমে। আমাকে ঘিরে ছিল এমন এক রাত, যার কোনো ভোর নেই—এমন আঁধার যাতে কোনো আলো নেই। আমার দায়িত্ব বলতে কিছুই ছিল না। আদেশ-নিষেধের কোনো শৃঙ্খল আমাকে বিরক্ত করত না। উপভোগ আর আনন্দই ছিল আমার জীবনের সব, জীবনই ছিল আমার স্বপ্ন। মনের আনন্দে আমি গাইতাম, আবৃত্তি করতাম। হাসির ফোয়ারা ছুটত আমার মুখে। সদ্য শোনা গানের কলিগুলো গুনগুন করতে করতে কাটত আমার দিন। অবাধে বিচরণ করতাম জীবনের প্রান্তরে। কোনো বিধি-নিষেধের বালাই ছিল না কোথাও।

দেখতে দেখতে কেটে যায় বিশটি বছর। আমার কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকে না। এতদিনে আমি হয়ে উঠি পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ—যা ছিঁড়ার উপযুক্ত হয়েছে। কোন সেই রাজপুত্র যে আমাকে ঘরে তুলবে? অবশেষে সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। আমার জীবনসাথি ঠিক আমার মতোই এক অস্থিরচিত্ত যুবক। এক ধরনের মোহাচ্ছন্নতা সারাক্ষণ তাকে ঘিরে রাখে। গান ছাড়া তার এক মুহূর্তও চলে না। গুনাহ আর নাফরমানিতে কাটে তার দিন। আমার মনে হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে কালো বর্ণের পাখি যেন আমাকে ঘিরে ধরে। আমায় নিয়ে যাত্রা করে অন্ধকার আসমানে।

পাপ, পঙ্কিলতা আর নাফরমানিতে ঘেরা আমাদের জিন্দেগি। গানে গানে আমরা যেন পুরো জীবনটাকে মাতিয়ে তুলি। মনে হয় হায়াতের কোনো শেষ নেই। এর দৈর্ঘ্য নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের একই চিন্তা একই স্বভাব। নতুন নতুন গান নিয়ে আমরা কথা বলি। দেশ-বিদেশের ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখে সময় বেশ কেটে যায়।

এভাবে আমাদের বিয়ের দশ বছর অতিবাহিত হয়। একসময় আমার চেহারায় দেখা দেয় ক্লান্তির ছাপ। ক্রমশ মলিন হয়ে আসে জীবনের উজ্জ্বলতা। জিন্দেগির ত্রিশটি বসন্ত কেটে যায়। মনে হয় একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে হেঁটে চলেছি আমি।

সূর্যের আলো যেমন ঝেটিয়ে বিদায় করে রাতের আঁধার। গ্রীষ্মের আকাশে কালবৈশাখীর ঘনঘটা যেমন ডেকে আনে বজ্রপাতের কড়কড় আওয়াজ আর বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো চমক। তারপর শুরু হয় অঝোর ধারায় অবিরল বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা যেন স্বপ্নের আলপনা আর রংধনুতে দেখি প্রশান্তির ছোটাছুটি। ঠিক এমনই এক পরিবর্তন নেমে আসে আমার জীবনে।

একদিন এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আমাকে একটি বয়ানের ক্যাসেট উপহার দেয়। দেয়ার সময় বলে, 'এটি সন্তানের তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে।' মনে পড়ে, কয়েক মাস আগে তার সঙ্গে একবার আমি এই প্রসঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল। ক্যাসেটটি প্রথমবার শুনেই আমি মুগ্ধ হই। তারপর সেটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিন কি চারবার শুনি। আমি শুধু বিস্মিত হয়েছি যে তা নয়—কিছু কিছু পয়েন্ট আমার হৃদয়ে এতটাই দাগ কাটে যে সেগুলো আমি একটি খাতায় নোট করি। শাইখের মর্মস্পর্শী বয়ান শুনে আমি অভিভূত হই। একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় এসে যেন আমার হৃদয়ের গাফিলতির বটবৃক্ষটি সমূলে উপড়ে ফেলে। আমাকে জাগিয়ে তোলে গাফিলতির মরণ নিদ্রা থেকে। হঠাৎ একটি পরিবর্তনের ঝাপটা এসে সবকিছু যেন বদলে দিয়ে যায়। গানের ক্যাসেটগুলোর প্রতি কোনো আগ্রহই আমার বাকি নেই। আমি আরও বয়ানের ক্যাসেট সংগ্রহ করতে শুরু করি। আমার হুঁশ ফিরে আসার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে থাকি। হিদায়াতের এক দুর্নিবার বাসনা জেগে ওঠে

মনের গহীনে। দিব্যি বুঝতে পারি, আমার বর্তমান ভাবনাই সচেতন মনের প্রতিক্রিয়া। পূর্বের সব চিন্তাই কেবল মরীচিকা। এটিই আমার জাগরণ। আগেরটা গাফলত। কিন্তু একটি বিষয় আমার মনে ভীষণ পীড়া দেয়—ত্রিশ বছর তো নাফরমানিতে নাফরমানিতে কেটে গেল! ভাবতে ভাবতে আমি অস্থির হয়ে উঠি। বিষণ্ন মনটি অনুতাপে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এরি মাঝে যেন আমার নতুন জন্ম হয়। সবকিছুতেই পরিবর্তন আসতে শুরু করে। অন্তরের যত অবহেলা আর অলসতা সবকিছু ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলি। বাড়িতে যত নাফরমানির যন্ত্রপাতি ছিল সব ঝেটিয়ে বিদায় করি। ছুঁড়ে ফেলি হৃদয়ের মলিন ও পঙ্কিল অনুভূতিগুলো। অবস্থা দেখে আমার স্বামী শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন :

- কী হলো তোমার? কী শুরু করলে এসব? কে বলেছে তোমাকে এসব হারাম? তোমার মাথায় এসব কে ঢুকিয়েছে? দশ বছর পর তুমি এসব কি আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছ? কবে থেকে হারামের এই হুকুম নাজিল হলো?

- এটি আল্লাহর আদেশ ও তার বিধান। হে আমার স্বামী! আমরা একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গে হেঁটে চলেছি। পায়ে পায়ে আমরা ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আজ থেকে আপনার জন্য সালাতে নিয়মিত হওয়া জরুরি।

- মাথা ঠিক আছে তো তোমার?

- অবশ্যই। সচেতন মস্তিষ্কেই আমি এসব বলছি। (আমার কণ্ঠে দৃঢ়তা)

উত্তরে তিনি এমন কিছু বলেন, যা না শুনলেই ভালো। তার নিদ্রা ছিল গভীর। গাফিলতি তাকে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তনই তিনি স্বীকার করেন না। আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখি। মেহনত করে যাই। বিষয়গুলো তাকে বুঝাতে থাকি। কখনো আল্লাহর ভয় দেখাই। কখনো জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ও পুলসিরাতের কথা বলি। কখনো বলি অন্ধকার কবরের কথা। কিন্তু তার হৃদয় যেন জমানো পাথর—কিছুতেই নরম হয় না।

আমার দিনগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। বিষণ্নতাই হয়ে ওঠে প্রতিদিনের সঙ্গী। সন্তানদের নিয়ে খুব ভাবনা হয়। একজন বেনামাজি স্বামীর সঙ্গে আমার কিছুতেই মন বসে না। কুরআনের আয়াতগুলো শুনলে আমার রাতে ঘুম হয় না—

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾

'তোমাদেরকে কীসে সাকার জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, "আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।"'[১৯]

কত বার যে তার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলি তার কোনো হিসেব নেই। তাকে প্রাচীন ও বর্তমান আলিমদের ফতওয়া দেখাই, 'যে সালাত আদায় করে না, তার সঙ্গে স্ত্রী ঘর করতে পারে না। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জরুরি। কেননা, সে কাফির।' আমার কথা শুনে তিনি ঠান্ডা দৃষ্টিতে সবকিছুর দিকে তাকান। বিষয়টি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। ক্রমশ আমাদের বৈবাহিক বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। আমার ওপর একের পর এক মুসিবত আপতিত হতে থাকে। হাসি-ঠাট্টা আর হুমকি-ধমকি সমান তালে চলতে থাকে। সবকিছু উপেক্ষা করে আমি তাকে বুঝাতে থাকি। একসময় আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। একজন বেনামাজি থেকে আর কী আশা করা যায়! কখনো মনে হয়, আমি যেন একটি দুঃখের চক্রে বন্দী জীবন কাটাচ্ছি। চিন্তা করতে করতে আমি হারিয়ে ফেলি ঘুমের স্বাদ। আমি কয়েকজন শাইখকে ফোন করি। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করি। নিজেকে নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। সন্তানদের নিয়েই আমার যত ভাবনা।

দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা অব্যাহত রাখি আমি। ধীরে ধীরে বিষয়টির স্পর্শকাতরতা বুঝতে পারি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের উভয় জাহানের সাফল্য। আমি দুনিয়ার ওপর আখিরাতকেই প্রাধান্য দিই। জান্নাতকেই আমি বেছে নিই—যার সীমানা আসমান-জমিনকেও ছাড়িয়ে যায়। নশ্বর এই পৃথিবীর প্রতি কোনো আগ্রহই খুঁজে পাই না। আমি স্বামীর কাছে তালাক চাই।

তালাক মেয়েদের জন্য কঠিন একটি ব্যাপার। লোহার শিকের মতো যা হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরকে খুলে দেন। আমার

---

১৯. সুরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৪২-৪৩।

মনকে প্রশান্ত করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টিকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। হয়তো এই ত্যাগের বিনিময়ে আমার বিগত জীবনের সব গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। নিজেকে নিয়ে এবং সন্তানদের নিয়ে আমি কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হই। তাদের কথা আমি ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু চোখের অবাধ্য অশ্রু বারবার তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার কাছের এক আত্মীয় বলে, 'তোমার সন্তানদের অভিভাবক হওয়ার অধিকার তোমার স্বামীর নেই। কেননা, তিনি বেনামাজি কাফির। আর সন্তানরা মুসলমান। মুসলমানের ওপর কাফিরের কর্তৃত্ব চলে না।'

ইউসুফ ﷺ এর ঘটনা পড়ে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করি। অশ্রুধারা যেন থামতেই চায় না। সেদিন সকালে নতুন করে জেগে ওঠে সন্তানদের বিরহ বেদনা। আগের রাতটা বড়ই দীর্ঘ মনে হয়েছিল। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই মাদরাসায় গিয়ে আমি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সন্তানদের বিরহ আমি আর সহ্য করতে পারি না। হৃদয়ে একটি অঙ্গার যেন ধিকি-ধিকি জ্বলছে। পেরেশানির আতিশয্যে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই আমি আবেগ প্রকাশ করব না। আমার হৃদয়ের অবস্থা তাদের জানতে দেবো না। ধীর-স্থির ও প্রশান্ত থাকব। কিন্তু কোথায় স্থিরতা...। ব্যাগভরে আমি মিষ্টি ও হালুয়া নিয়ে যাই। আমার মেয়ে এসব খেতে খুব পছন্দ করে।

ধীরে ধীরে মাদরাসার ফটকে এসে দাঁড়াই। উত্তেজনায় হৃদয় ধুকপুক করতে থাকে। ডানে-বামে সতর্ক দৃষ্টি বুলাই। গেইটের পরে ছোট একটি আঙিনা তারপর মাদরাসার অফিস। ধীর পদে হেঁটে অফিসে প্রবেশ করি। প্রধান শিক্ষিকা আমাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করেন। মনের সব জোর জমা করে আমি কথা বলার প্রস্তুতি নিই। বারবার কপালের ঘাম মুছি। হাতের আঙুলগুলো মৃদু কাঁপতে থাকে। জিহ্বাটা যেন মুখের সঙ্গে লেপ্টে আছে। হঠাৎ খুব তৃষ্ণা পায় আমার।

অবশেষে প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা শুরু হয়। তিনি খোলা মনে আমার সঙ্গে কথা বলেন। ধীরে ধীরে আমি সহজ হয়ে উঠি। তিনি আমার মেয়ের

অনেক প্রশংসা করেন। তার হিফজের অসাধারণ দক্ষতার কথা বলেন। অনেক্ষণ কথা হয়। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি। কথার মাঝখানে বলি, 'মেয়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

দরোজা খুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে আমার মেয়ে। গভীর আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরি। ঝাপসা হয়ে আসে আমার চোখ। কণ্ঠস্বর বড় হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষিকার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায় আমার দুর্বলতা। সব শুনে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেন। সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'সবর করুন। ভয় পাবেন না। আল্লাহ তাআলা আপনার তাওবার সত্যতা পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ আপনার এই ত্যাগের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো প্রিয় জিনিস কুরবানি দেয়, আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করেন। এই পরীক্ষায় আপনি অবশ্যই উত্তীর্ণ হবেন ইনশাআল্লাহ।' ধীরে ধীরে মাদরাসাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসি। নিজেকে ধমক দিই—কী দরকার ছিল এখানে আসার।

দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। সন্তানদের বিচ্ছেদ-বেদনা আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। তাদের খোঁজ-খবর রাখার চেষ্টা করি। দেখতে দেখতে কেটে যায় দীর্ঘ ছয় মাস। বিরহের বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আমি সবরের স্বাদও পেতে শুরু করি। কখনো মনে হয়, কতদিন হয়ে গেল আমি সন্তানদের প্রিয়মুখ দেখি না—শুনি না তাদের মধুর আওয়াজ। আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকি। অবশেষে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেন। আমি ফিরে পাই আমার সন্তানদের। কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় ভরে ওঠে বুকটা। পরম সাহসের সঙ্গে আমি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। মনে পড়ে, আমার চেতনা ফেরার প্রথম দিনটির কথা। দ্রুত আমি সেই ক্যাসেটটি খুঁজে বের করি।

এই আশাতীত সৌভাগ্যে আল্লাহর শোকর আদায় করি। তাওবা করতে পেরে নিজের জীবনকে ধন্য মনে হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আঁধার সুড়ঙ্গ থেকে আল্লাহ আমাকে আলোর ময়দানে নিয়ে এসেছেন। মুসিবতে সবর করার তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহর তাআলা যেন আমাকে দ্বীনের পথে অটল অবিচল রাখেন—এই দোয়াই করে যাব সারাটা জীবন।

জাদুকর

“

সালামা বিন দিনার ﷺ তাঁর সহচরদের বলেন, ‘আমার মন চায়, তোমরা দ্বীনের ওপর এমন অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, যেমনটা জুতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকো।’

দুনিয়া থেকে আমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। জীবনের রাজপথ ছেড়ে যেন হেঁটে চলছি কোনো এক মেঠো পথ ধরে। মাদরাসা থেকে চলে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সহপাঠীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সেদিন এক শিক্ষিকা ফোন করে জানান, তিনি আমাকে দেখতে আসবেন। এক মাস বা দুমাস পরপর তিনি আমাকে দেখতে আসেন। আগামী পরশু তার আসার কথা। আমি অপেক্ষার প্রহর গুনি। রাতগুলো অনেক দীর্ঘ মনে হয়।

খুব মন চায় কোনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হোক। তার সঙ্গে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যথাগুলো শেয়ার করি। মনটাকে একটু হালকা করি। একটি প্রশ্নই কেবল মাথায় ঘুরপাক খায়—কোথায় গেল মানুষের মহব্বত? কোথায় ওয়াফাদারি?

মাদরাসায় যাদের আমি হাসিতে মাতিয়ে রাখতাম তারা আজ কোথায়? যারা বছরের পর বছর আমার পাশে বসত, তারা কোথায় চলে গেল আজ? নিজের সাথেই বাস করি আমি। বড়ই একা মনে হয় নিজেকে। কান্নাই আমার সাথি। দুঃখের সঙ্গে গল্প করেই কাটে আমার রাত। চিন্তা আর পেরেশানিই আমার নিত্য সহচর। ভাবনাগুলো বিক্ষিপ্ত। আম্মু আমার পাশে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত। কত দিন হয়ে গেল মানুষের কোনো জমায়েত

দেখি না। কোনো উপলক্ষ্যেই আমাকে দাওয়াত দেয়া হয় না। আমন্ত্রণ করা হলেও আমি যাব কীভাবে? আমি তো স্বাভাবিকভাবে সহজ ভঙ্গিতে চলাফেরা করতে পারি না। বিশেষ করে যেসব জায়গায় একটু ছোটাছুটি করতে হয়, একটু উদ্যমী হতে হয়—একটু চঞ্চল হয়ে হাসি-খুশি প্রকাশ করতে হয়। আমি তো অমন নই।

প্রত্যাশাগুলো সব দল বেঁধে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। নিরাশার নিষ্ঠুর বেষ্টনীতে আটকা পড়ে আমি কেবল হায়-হুতাশ করি। কখনো আম্মু আমাকে সান্ত্বনা দেন। পানি সিঞ্চন করেন হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হতাশার আগুনে। তার মধুর আওয়াজ কানে যেন সুধা বর্ষণ করে—'মেয়ে আমার! একটু সবর করো। সাওয়াবের আশা রাখো। মুমিনের সবকিছু কল্যাণের জন্যই হয়। সর্বদা আল্লাহর জিকিরে জবানকে সিক্ত রাখো। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হও। আজেবাজে কল্পনা করে একটি মিনিটও নষ্ট করো না।'

অবশেষে আমার প্রিয় সেই শিক্ষিকা আমাকে দেখতে আসেন। খুব অল্প সময় তিনি আমাদের বাড়িতে থাকেন। তবে এই পুরো সময়টা তিনি আমার সঙ্গে কাটান। তার কথাগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রতিটি আলোচনাই অন্তরে দাগ কাটে। মনে সাহস সঞ্চার করে। তিনি চলে যাওয়ার পরও তার সুন্দর কথাগুলো আমার কানে গুঞ্জরিত হয়। প্রতিবারই তিনি কিছু না কিছু হাদিয়া নিয়ে আসেন—কয়েকটি মূল্যবান কিতাব বা বয়ানের ক্যাসেট।

পূর্ণ একটি বছর তিনি এভাবে আমাকে সময় দেন। মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসেন। একবার তিনি বলেন, খুব দ্রুত তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই খবর শুনে আমি খুব খুশি হই। কিন্তু বিয়ের পর থেকে তার আসা-যাওয়া কমতে থাকে। তাকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিতে থাকে সময়। যদিও তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাকে আমি খুলে বলেছি; তিনি আমার চোখের পানিও দেখেছেন—তার সঙ্গে দেখা করতে আমি যে পাগলপারা তাও তিনি জানেন। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

একটি মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিবাহিত হয় আমার জীবন। যে মুখে কথার খই ফুটত, তা যেন একেবারে নীরব হয়ে যায়। যে অন্তর কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকত, তা যেন একেবারে নীরস ও বিষণ্ন হয়ে পড়ে। ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা সেই মুচকি হাসিটিও গায়েব হয়ে গেছে। এভাবে কেটে যায় দীর্ঘ সময়।

একদিন তিনি আমাকে ফোন করেন। আমি খুশিতে ফেটে পড়ি। তার কি এখনো মনে আছে আমার কথা! তিনি বলেন, 'তোমাকে আমি সব সময় স্মরণ করি। কল্পনায় তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই আমি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে তোমার জন্য দোয়া করি। কিন্তু আমার স্বামী দূরের একটি শহরে বদলি হয়েছেন। তাই চাইলেও তোমার কাছে আসতে পারি না। প্রায়ই ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়।'

এরপর আবার সেই বিচ্ছেদ—সেই নীরবতা। সময় বয়ে চলে তার আপন গতিতে। মানসিক অস্থিরতা রাতগুলোকে খুব দীর্ঘ করে তোলে। অদ্ভুত এক আঁধারে ছেয়ে থাকে মন। দুনিয়ার আঁধারের চেয়েও কালো সেই অন্ধকার। সেদিন রাতে মনটা স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি বিষণ্ন ছিল। তাই আমার চাচাতো বোনকে ফোন দিই—

- হ্যালো! কেমন আছো তুমি? অনেক দিন দেখা হয় না তোমার সাথে। কোথায়?
- আলহামদুলিল্লাহ! আমি পড়াশোনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তোমার জন্য একটি সারপ্রাইজ আছে।
- কী সারপ্রাইজ বলে ফেলো। এই নিরানন্দ জীবনে আবার কীসের সারপ্রাইজ?
- নাহ, আজ বলব না। আগামীকাল শুনবে।

এখানেই কথা শেষ হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কোথায় ঘুম! কখনো ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়েই চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে যায়। সারা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। শুয়ে শুয়ে সারপ্রাইজের বিষয়টি নিয়ে ভাবি। আবার কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি নিজেই জানি না।

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। ফজরের সালাত আদায় করে আবার শুয়ে থাকি। এই সকালেও শরীরটা কেমন ক্লান্ত মনে হয়। জানালার ফাঁক গলে সূর্যের সোনালি রশ্মি প্রবেশ করে আমার রুমে। হঠাৎ মনে পড়ে সারপ্রাইজের কথা। কী হতে পারে সেটি? সে কি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবে? কোনো উপহার? অনেক কিছু ভাবি। সময়টা কেমন যেন স্থির হয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা যেন খুব ধীরে ঘুরছে আজ। আসরের সালাতের পর আমি তার জন্য অপেক্ষা করি—হয়তো সে আসবে।

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। তার কোনো দেখা নেই। আমি বিরক্ত হয়ে যাই। তাকে ফোন করি। সে নাকি ঘুমাচ্ছে। আধা ঘণ্টা পর আবার ফোন করি। তখনও নাকি ঘুমাচ্ছে। মাগরিবের পরও তাকে পাওয়া গেল না। আমার সবরও পৌঁছে যায় শেষ সীমায়। মনে মনে বলি, এই জীবনে আমার সারপ্রাইজের দরকার নেই। এসব নিয়ে আমার কোনো আফসোস বা আগ্রহও নেই।

অনেক দিন পর সে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। আমাকে জিজ্ঞেস করে—'সারপ্রাইজের কথা মনে আছে?' আমি বিরক্তিতে ভ্রু কুঞ্চিত করি। সে বলে, 'সহজভাবে নাও ফাতিমা। তোমার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার জন্য সারপ্রাইজ! জীবনে সুযোগ সব সময় আসে না। তোমার রোগ ভালো করার এটিই সুযোগ! বিছানায় পড়ে থাকার বিরক্তি থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছ তুমি।' বিস্ময়ে আমার মুখ হা হয়ে যায়। খুশিতে হৃদয়টা যেন এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসবে। চকিতে কম্পন ধরে যায় আমার পাঁজরে। সে বলে, 'শোনো! আমার এক বান্ধবী এমন এক নেককার ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছে, যে তোমার রোগ ধরতে পারবে। আমার খালাতো বোন অনেক দিন ধরে দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে ভুগছিল। কত ডাক্তার দেখিয়েছে। কত হাসপাতালে ঘুরেছে—কাজ হয়নি। অবশেষে তার কাছে যায়। অল্প দিনেই সেরে যায় সে। আমার এক বান্ধবীর বড় বোনের বাচ্চা হচ্ছিল না। অনেক ঘোরাঘুরির পর তার কাছে যায়। এখন সে তিন মাসের গর্ভবতী। জুয়াইরিয়াকে তো তুমি চেনো। ওই যে আবরারের ছোট বোন। তার সঙ্গে স্বামীর বনিবনা হচ্ছিল না কিছুতেই। কয়েকবার তালাকের হুমকি দেয় সে। অবশেষে ওই লোকটির কাছে চিকিৎসা করে সে। এখন সব

ঠিকঠাক। তাদের কী সুন্দর সম্পর্ক এখন। এদিকে তুমি বেচারি পুরো জীবন কঠিন রোগ বয়ে বেড়াচ্ছ। তুমি সুস্থ হতে চাও না? তুমি কি বিয়ে করবে না? সংসার পাতার আগ্রহ কি তোমার নেই? তুমি কি চাও না বাচ্চার মা হতে—যা তোমার হৃদয়কে ভরিয়ে দেবে?' তার কথা শুনে আমার মন আনন্দে ভরে যায়। স্বপ্নরা যেন ছোটাছুটি শুরু করে। আমি আর অন্য কিছু ভাবতে পারি না। সে আরও বলে, 'আল্লাহ যদি তোমার সুস্থতা লিখে রাখে, তবে অবশ্যই তুমি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। তুমি দাম্পত্য জীবনে পদার্পণ করতে পারবে। বাচ্চার মা হতে পারবে।'

সহসা আমার মনে একটি ভাবনার উদয় হয়। আমার দুর্বল ইমান কথা বলতে শুরু করে। ও তো জাদুকর! ওর কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? বিষয়টি আমি চাচাতো বোনকে জানাই। সে বলে, 'আরে নাহ! লোকটি নেককার। অনেকেই তো যাচ্ছে তার কাছে। আল্লাহর হুকুমে তারা সুস্থও হচ্ছে। আল্লাহই শিফা দানকারী। লোকটি তো অসিলামাত্র। ঘাস, লতাগুল্ম ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করে সে।'

তার কথা শুনে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। আমার হৃদয়ে ইমানের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। দীর্ঘ রোগভোগে কীভাবে যেন ইমানও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আমরা কখন যাচ্ছি তার কাছে?' সে বলে, 'তোকে আমি ফোন করে জানাব।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কয়েক দিন পর সে ফোন করে তার বাসায় যেতে বলে। ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি, সে গাড়ি নিয়ে গেইটের বাইরে অপেক্ষা করছে। চড়ে বসতেই ছুটতে শুরু করে কারটি। সে আমাকে বলে, 'ওখানে গিয়ে তোমার কিছু বলার দরকার নেই। যা বলার আমিই বলব।' জবাবে আমি জোরে হেসে উঠি। সে বলে, 'যখন তুমি বিয়ে করবে আমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবে?' আমি কোনো জবাব দিই না। কেবল মুচকি হাসি। দুই ঘণ্টা চলার পর একটি সংকীর্ণ গলিতে গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামায়। আমরা দুজন নেমে পড়ি। সে আমার আগে আগে হাঁটে। আমি তার পিছু পিছু চলি। ডানে-বামে তাকাই।

কিছু দূরে গিয়ে সে একটি বাড়ির দরোজায় নক করে। বারবার এদিক ওদিক তাকায়। তার অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। আমরা চোর নাকি? এরূপ আচরণ করার কী অর্থ হতে পারে! একটু পর ভেতর থেকে দরোজা খোলার শব্দ শোনা যায়। ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে থাকি। ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্ধকার। ভাঙাচোরা একটি বাড়ি। লোকটি নিশ্চয় গরিব।

দরোজা খোলে কদর্য চেহারার এক লোক। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হয়। জীর্ণশীর্ণ শরীর। কোটরাগত চোখদুটো কেমন যেন ঘোলাটে। হাতদুটো মৃদু কাঁপছে তার। ভয়ে আমি কুঁকড়ে যাই। ইস! এখানে কেন এলাম! আমার দৌড়ে পালাতে মন চাইল। কিন্তু নড়ার শক্তিও যেন আমার নেই। মনে মনে বলি, আল্লাহ আমাকে রহম করুন। জীবনে যা দেখিনি তা আজ দেখতে হলো।

ঘরের ভেতর আলো-আঁধারির খেলা। গলি বেয়ে খানিকটা হেঁটে আমরা একটি রুমে চলে আসি। আমি শক্ত করে চাচাতো বোনের হাত ধরে রাখি।

সে লোকটিকে বলে, 'এ আমার চাচাতো বোন। আপনি একটু তার রোগের ব্যাপারটি দেখুন। আপনি যা-ই চান, আপনাকে তা-ই দেয়া হবে।' তার কণ্ঠ কেমন যেন কর্কশ শোনায়। লোকটি বলে, 'টাকা-পয়সা বড় কথা নয়। তার সুস্থতাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ শিফা দানকারী।' এই বলে সে বিকট শব্দে কাশতে শুরু করে। অনেক কষ্টে কাশি থামিয়ে উচ্চ আওয়াজে পড়ে : (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) 'যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।'[২০] তারপর বিশ্রী একটি হাসি দেয়। হলুদ দাঁতগুলো দেখে আমার ঘেন্না ধরে যায়। সহসা শক্ত হয়ে ওঠে তার চোখ-মুখ। গম্ভীর কণ্ঠে চাচাতো বোনকে জিজ্ঞেস করে—

- রোগীর নাম কী?

- সাওদা।

- পিতার নাম?

- আব্দুল্লাহ।

---

২০. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৮০।

এভাবে সে নানান তথ্য জিজ্ঞেস করতে থাকে। অনেক্ষণ চলে প্রশ্নোত্তরের এই ধারা। তারপর আমার দিকে তাকায় সে—তোমাকে কয়েকটি ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করব। সঠিক হলে 'হ্যাঁ' বলবে আর না হলে 'না' বলবে।

- তুমি একসময় খুব চঞ্চল ছিলে আর সবাই তোমাকে ভালোবাসত।

- হ্যাঁ।

- সহপাঠীরা সবাই তোমাকে ঈর্ষা করত।

- হ্যাঁ।

- অনেক ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেছ; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

- হ্যাঁ।

- পড়াশোনায় তুমি খুব ভালো ছিলে।

- হ্যাঁ।

এভাবে সে আমাকে অনেক প্রশ্ন করে। আমি সব প্রশ্নের উত্তরেই হ্যাঁ বলি। তারপর অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে যায় সে। মনে হয়, একটি পাহাড় সরে গেল আমার বুক থেকে। চাচাতো বোন আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'দেখলে?—তার সব কথাই ঠিক! সে সবকিছু জানে।' কয়েক মিনিট পর সে ফিরে আসে। তার কথা শুনে মনে হয়, সে আমাদের চলে যেতে বলছে। কম্পিত হস্তে চাচাতো বোনের দিকে ইশারা করে বলে, 'তুমি কয়েক দিন পর এসে ওষুধ নিয়ে যেয়ো।'

আমরা দ্রুত ওখান থেকে বের হয়ে আসি। গাড়িতে বসে স্বস্তির নিশ্বাস নিই। মনে মনে বলি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। চাচাতো বোনকে অনেক প্রফুল্ল মনে হয়। কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই। মানসিক অস্থিরতা আরও বেড়েছে। কষ্টের ওপর কষ্ট। অশান্তির ওপর অশান্তি। অন্তরের গভীরে একটি তীক্ষ্ণ অনুভূতি যেন ছোটাছুটি করছে। আমার কানে চিৎকার করে বলছে, তুমি জাহান্নামের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেলে। ওই দিন সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি। হাজারো চিন্তা ও পেরেশানি আমায় ঘিরে ধরে। দুশ্চিন্তা যেন জেঁকে বসে আমার হৃদয়ে। মনে বারবার একটি প্রশ্নই ঘুরপাক

খায়—ওই সংকীর্ণ গলিপথ ধরে কোথায় গিয়েছি আমি? ওই অন্ধকার বাড়িতে যাওয়ার কী দরকার ছিল? লোকটার কদর্য চেহারা মনে পড়লেই ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজেকে অনেক তিরস্কার করি। কখনো ভেঙে পড়ি কান্নায়। কিন্তু তখনো সুস্থ হওয়ার এক চিলতে আশা ঝিলিক দিয়ে ওঠে মনের কোণে। কে যেন বলে, তুমি কি দেখোনি—সে কুরআন পড়ছে? বারবার আল্লাহকেই শিফা দানকারী বলছে? লোকটি নেককার—লোকটি জাদুকর। নাহ! জাদুকর আবার নেককার হয় কীভাবে? সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায় আমার। অন্ধকারে ছেয়ে যায় মনটা। ভয় ও শঙ্কা আমায় ঘিরে ধরে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

দুদিন পর আমার চাচাতো বোন আসে। চিৎকার করে আমাকে ডাকে। একপাশে নিয়ে বসায়। 'চলো তোমাকে সব শিখিয়ে দিই। মনে রাখতে হবে। নাহ! ভুলে যাবে তুমি। খাতা-কলম নিয়ে এসো—লিখে রাখতে হবে। এই দেখো সব ওষুধ নিয়ে এসেছি। লিখো—এটি সকালে পান করবে। এটি বিকেলে খাবে। এটি রাতে পুড়িয়ে শ্বাস নেবে। এই বাতিটি রাতে জ্বালাবে।' লম্বা তালিকা। এত ওষুধ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। সে বলে, 'চিকিৎসায় কোনোরূপ অবহেলা করা যাবে না। এটি অনেক সূক্ষ্ম চিকিৎসাপদ্ধতি। আমি সব খরচ দিয়ে দিয়েছি।' খরচের পরিমাণ শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এত বেশি? সে বলে, 'তোমার সুস্থতা যদি আরও বেশিকিছু দিয়ে কিনতে হতো, তবুও আমি কিনে আনতাম। চলো, এবার চিকিৎসা শুরু করো।'

আমি নিয়মিত ওষুধ খাই। পান করি। রাতে ধূপ জ্বালাই। কিন্তু তাদের কথা অনুযায়ী কোনো সুন্দর স্বপ্ন দেখি না। বরং আরও দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকি। সাপ, বিচ্ছু আর ভয়ংকর সব প্রাণী সারা রাত আমাকে তাড়া করে। কখনো বোবায় ধরে। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। তারা বলেছিল, দ্বিতীয় রাতে আমি অদ্ভুত কিছু অনুভব করব। কিন্তু কিছুই হয় না। আমার একটি চুলও নড়ে না।

টানা দুমাস আমি চিকিৎসা চালিয়ে যাই। ধীরে ধীরে আমার উৎসাহে ভাটা পড়ে। সুস্থ হওয়ার আশা উবে যেতে থাকে।

একদিন সুন্দর এক বিকেলে আমার সেই শিক্ষিকা আমাকে দেখতে আসেন। খুশিতে আমি আত্মহারা। তার কাছে অনেক অনুযোগ করি আমি। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি—তার চোখে সৌভাগ্যের উজ্জ্বলতা। ঠোঁটে খুশির আভাস। অপূর্ব এক হাসি তার চেহারাকে আরও কমনীয় করে তুলেছে। তিনি আমার কপালে চুমু খান। একে একে বাড়ির সবার খবর নেন—আব্বু, আম্মু, ভাই, বোন, ফুফু কেউ বাদ যায় না। কী সুন্দর তার চরিত্র। কত উদার তার মন।

কথার ফাঁকে তিনি আমার মনকে ভালো করার জন্য অনেক কথা বলেন। এক যুবকের কথা বলেন, যার হাত-পা সব অবশ। চলতে পারে না। কথা বলতে পারে না। সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তুমি তো চলাফেরা করতে পারো। কথা বলতে পারো। অনেকেই তাও পারে না। কত কষ্ট তাদের। তার কথা শুনে আমার নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে হয়। এভাবে কথা চলতে থাকে।

ধীরে ধীরে আমি আমার সব অবস্থা তুলে ধরি। বুকে অনেক কথা জমে আছে। এতদিন শেয়ার করার জন্য কাউকে পাইনি। তার ভালোবাসা দেখে আমি অভিভূত। মনে মনে বলি, আমার সব কথা তাকে বলব। জাদুকরের বিষয়টিও তাকে বলা দরকার। আমি মনে মনে সব কথা গুছিয়ে নিই। বলতে গিয়ে কেমন ভয় ভয় লাগে। আমার হাত-পা মৃদু কাঁপতে থাকে। অবশেষে সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বলতে শুরু করি। তিনি আশ্চর্য হয়ে শুনেন। আমার কণ্ঠের ওঠানামা পর্যন্ত তার নজর এড়ায় না। আমার শেষ কথা—এত কিছু করার পরও আমি সুস্থ হতে পারিনি। এই বলে আমি গল্প শেষ করি। তিনি বলে ওঠেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! তুমি কীভাবে যেতে রাজি হলে? এই দরোজায় কড়া নাড়ার সাহস কেমনে হলো? তুমি আল্লাহর নাফরমানিতে সুস্থতা খুঁজে বেড়াচ্ছ? তুমি কি শোনোনি রাসুলুল্লাহ ﷺ কী বলেছেন—(مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) "যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং

তার কথাকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদের ওপর নাজিলকৃত শরিয়তের সাথে কুফরি করে।'"[২১]

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর অনুচ্চ আওয়াজে বলি, 'আমি জানি, আপনি যা বলছেন, পুরোপুরি সঠিক। কিন্তু আমার ইমান দুর্বল ছিল। সবকিছু যেন হঠাৎ করে হয়ে গেল। সেখান থেকে ফিরেই আমি সব বুঝতে পেরেছি। কত কেঁদেছি আমি এই ভুলের জন্য। তবে কিছু বিষয় আমাকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। সে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছিল। বারবার বলছিল, আল্লাহই শিফা দানকারী। টাকা-পয়সার প্রতিও তার আগ্রহ দেখলাম না।' এসবে কান না দিয়ে তিনি জানতে চান—

- বাহ্যিক বেশভূষা দেখে কি তোমার তাকে নেককার ও পরহেজগার মনে হয়েছিল?
- নাহ!
- যে কাগজগুলো পুড়িয়ে সে শ্বাস নিতে বলেছিল, তুমি সেগুলো পড়ে দেখেছ?
- নাহ। সেগুলো পড়া যায় না। আজগুবি সব আঁকিবুকি, চিহ্ন আর নানান সংখ্যা।
- সে কি তোমার আব্বু-আম্মুর নাম জিজ্ঞেস করেনি?
- করেছে।
- বলো তো, চিকিৎসায় আব্বু-আম্মুর নামের কী দরকার?
- কিন্তু আমার অতীত জীবন সম্পর্কে এত সঠিকভাবে এত কথা সে কীভাবে বলতে পারল?
- তোমাকে যা বলেছে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই সেগুলো প্রযোজ্য। তুমি তার কথাগুলো আমাকে বলো তো...। এই কথাগুলো বলে সে এমন একটা ভান করে, যেন সে সবকিছুর খবর রাখে। সে কি তোমাকে মোরগ বা ভেড়া জবাই করতে বলেনি?

---

২১. মুসনাদু আবি দাউদ আত-তয়ালিসি : ৩৮১।

- বলেছে। তবে এটি আবশ্যক করেনি। সে বলেছে, 'যদি আমি একটি মোরগ বা দুম্বা জবাই করি, তবে শয়তান পালিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে আমি অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাব।'

- আল্লাহ কসম! সে তোমার তাওহিদ বিনষ্ট করতে চেয়েছে। আর কয়েক পা এগুলেই তুমি জাহান্নামে গিয়ে পতিত হতে। মন দিয়ে শোনো। তোমাকে একটি ঘটনা শোনাই—

একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একটি মাছির কারণে এক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আরেক লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করেন, 'এটি কীভাবে হবে হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বলেন, 'একবার দুব্যক্তি এমন এক কওমের কাছে যায়, যারা একটি মূর্তির পূজা করত। আর এই মূর্তির প্রতি কিছু উৎসর্গ না করে তারা মূর্তিটির কাছ দিয়ে যেত না। মূর্তিপূজারিরা ওই দুলোকের একজনকে বলে :

- খবরদার! আর সামনে এগুবে না। প্রথমে আমাদের খোদার প্রতি কিছু উৎসর্গ করো।

- আমার তো উৎসর্গ করার মতো কিছু নেই।

- একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করো।

সে একটি মাছি উৎসর্গ করে। লোকেরা তার পথ ছেড়ে দেয়। পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে, "এবার তোমার পালা। কিছু উৎসর্গ করো।" সে বলে, "আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি কিছুই উৎসর্গ করতে পারি না।" এই কথা শুনে তারা তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে। পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।"'

এই কাহিনীটি বলে আমার শিক্ষিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'দেখো, বিষয়টি কত স্পর্শকাতর। সতর্ক থেকো। শয়তান যেন তোমার ওপর বিজয়ী হতে না পারে। রোগ-ব্যাধি যেন তোমাকে দুর্বল করতে না পারে। তুমি কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করতে পারো। নিজে তিলাওয়াত করতে পারো। এটিই অধিক ফলদায়ক। অথবা কোনো নেককার লোক কুরআন পড়ে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করতে পারে। তুমি কুরআন তিলাওয়াত

শুনতে পারো নিয়মিত। আজগুবি আঁকিবুকি, তাবিজ-কবজ আর তন্ত্রমন্ত্র তোমার কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার তাকদিরে যা-ই রেখেছেন, তা-ই হবে।' বলতে বলতে তার কণ্ঠ কেমন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, 'তুমি যদি তাওহিদের ওপর অটল থেকে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, সেটাই তোমার জন্য ভালো, মুশরিক হয়ে সুস্থ অবস্থায় মরার চেয়ে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকো। আর শরিয়াসম্মত চিকিৎসা চালিয়ে যাও। তুমি জাদুকর লোকটির ব্যাপারে চিন্তা করে দেখো। তার যদি সত্যিই কোনো শক্তি থাকত, সে নিজের জন্য অবশ্যই প্রয়োগ করত। তুমি তো নিজেই দেখে এলে তার দারিদ্র্য জর্জরিত বেহাল দশা।' আমি মাথা নেড়ে সমর্থন করি। 'কে বেশি প্রিয় তার কাছে—সে নিজে নাকি তুমি? সে কেন নিজের এই দুরবস্থা পরিবর্তন করে না? এটি এমন এক রাস্তা, যা মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কোনো ব্যাপার না। জাহান্নামের আজাব ভোগ করার শক্তি কার আছে? যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। জাহান্নামই হয় তার ঠিকানা। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।'

আমার দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে অনুতাপের অশ্রু। অনুশোচনায় ভরে যায় মন। হৃদয়ে ইমানের আলো যেন ধপ করে জ্বলে ওঠে। আমি বলি, 'আপু! এখন আমি কী করব?' 'তাওবা করো। তাওবা করো। এটিই একমাত্র সমাধান। আল্লাহর দরোজা সবসময় খোলা। তোমার চাচাতো বোনের সঙ্গে আর কখনো যাবে না। তাকেও বোঝানোর চেষ্টা করো। জাদুকর থেকে তাওবাও তলব করা হবে না। তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।'

নতুন চাঁদ

“

‘স্বল্প পুঁজিতেই কাটিয়ে দাও ছোট্ট এ জীবন—খানিক বাদেই তো বেজে যাবে বিদায় ঘণ্টা—শুরু হবে যাত্রা তোমার অনন্ত জীবনের পথে। ব্যথিত হয়ো না ধনীদের ঐশ্বর্য দেখে, অবনত রেখো তোমার দৃষ্টি। সুষুপ্ত নিশীথে লুটিয়ে পড়ো রবের দরবারে। দুচোখে লাগাও দীর্ঘ অনিদ্রার পবিত্র সুরমা। দূরে রেখো হৃদয়কে প্রবৃত্তির লালসা থেকে—জীবন চলার পথে এটিই হবে তোমার পরম সাধনা। পার্থিব এ জীবন পরীক্ষা বৈ কিছু নয়। খেল-তামাশায় মগ্ন হয়ে বরবাদ করো না অমূল্য সময়গুলো। দুনিয়াপূজারিদের এই সমৃদ্ধি একদিন চিরতরে নিঃশেষিত হবে।’

সেদিন বিকেলে সে লোকদের বলতে শোনে, আগামীকাল ইদ হতে পারে। বড়দের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বকা শুনতে হয় তাকে। মন খারাপ করে চলে আসে সে।

ইদের খবর শুনে তার মধ্যে যেন একটি দায়িত্ববোধ চলে আসে। সব ধরনের খেলাধুলা ছেড়ে দেয় সে। খেলার সাথিদের কথাও যেন ভুলে যায়। সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে—কে কী বলছে। ইদই যেন তার ধ্যান-জ্ঞান। দ্রুত পদে সিঁড়ি ভেঙে সে ঘরের উপরের তলায় যায়। আঙিনায় ঘোরাফেরা করে। অবশেষে ব্যালকনিতে গিয়ে শান্তভাবে বসে থাকে। এভাবে কয়েক ঘণ্টা চলে যায়। এরি মধ্যে সে বারবার ঘর থেকে বের হয় আবার ফিরে আসে। অনেকের মুখে ইদের কথা শুনে খুশিতে তার চোখ-মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবশেষে সে যখন দেখে, ইমাম সাহেব

আর তারাবিহ পড়াচ্ছেন না, সে নিশ্চিত হয়ে যায় আগামীকাল ইদ হবেই। সে এমন একটা ভাব করে যেন সে-ই রাতের আঁধারের বুক চিরে ইদ নিয়ে এসেছে। শাওয়ালের চাঁদকে সে-ই ডেকে এনেছে।

দৌড়ে সে দাদার ঘরের দিকে ছোটে সুসংবাদটি দেয়ার জন্য। তার উচ্ছ্বাসিত আওয়াজ পুরো ঘর মাতিয়ে তোলে। উঁচু আওয়াজে সে দাদাকে ইদের আগমনী বার্তা শোনায়। তার আনন্দের বাহার দেখে দাদা খুশি হন। কিন্তু পরক্ষণেই তার দৃষ্টি ছুটে যায় জায়নামাজের দিকে। দুচোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। তিনি নাতিকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খান। শিশুর সঙ্গে তাল মেলাতে তিনিও ইদের খুশি প্রকাশ করেন।

জীবনের সত্তরটি বসন্ত কীভাবে যে হারিয়ে গেল তিনি বুঝতেই পারেন না। প্রিয় একটি মাসের বিদায় তার বুকে খুব করুণ হয়ে বাজে। কী বরকতময় একটি মাস! কী প্রাণাভিরাম তার আবহ! আল্লাহর ইবাদতগুজার বান্দারা কত খুশি হয়েছিল এই মুবারক মাসটির আগমনে। কিন্তু চোখের পলকেই যেন কেটে গেল প্রিয় মাসটি। মাহে রমজান। কল্যাণের মাস। কিয়ামুল লাইলের মাস। সাদাকার মাস। তারাবিহের মাস। সিয়াম সাধনার মাস। ইস! পুরো বছরটিই যদি রমজান হতো!

শিশু যখন বড় হয় তার চিন্তার মাপকাঠিতে পরিবর্তন আসে। যে ইদের চাঁদ দেখে সে খুশিতে আটখানা হয়, বড় হয়ে সে-ই রমজানের বিদায়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। ইদের সকালে তার মনে হয় ইবাদতের মাস তো হারিয়ে গেল—এবার শুরু হবে গুনাহের মৌসুম। এ কথাগুলো হৃদয়ে আরও কঠিন হয়ে বাজে যখন রমজানের ঠিক পরের জুমার খুতবায় ইমাম সাহেব বলেন, 'মুসল্লিরা সবাই কোথায় উধাও হয়ে গেল? রমজানে আমাদের সঙ্গে যারা সালাত আদায় করত তারা কোথায়? মসজিদ তো কানায় কানায় ভরা ছিল। এখন প্রথম কাতারও কেন পূর্ণ হয় না? তারা তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায় করত? তারা কি এখন নেই? তারা কি অন্য গ্রহের মানুষ?' ইমাম সাহেবের প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। ভাবতে ভাবতে চিন্তার বলি রেখা ফুটে ওঠে দাদার কপালে। ইবাদত কি কেবল রমজানের জন্য?

তিলাওয়াত কি কেবল রমজানের জন্য? রমজান তো ঘুরে দাঁড়াবার মাস। পুরো বছরের জন্য হিম্মত সঞ্চয়ের মাস। আত্মসমালোচনার মাস। আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার মাস। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! রমজানের সাথে সাথে মানুষ ইবাদতকেও বিদায় দিয়ে দেয় পুরো এক বছরের জন্য। কুরআনগুলো তুলে রাখে। নফল ছেড়ে দেয়। ফরজগুলোর ব্যাপারে গাফিল হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তাআলা ইবাদতের সীমারেখা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

'তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো।'[২২]

পর্দা

❝

বিলাল বিন সাদ ﷺ বলেন, 'কত সুখী আত্মপ্রবঞ্চিত মানুষ আছে যারা খায়, পান করে, প্রাণ খুলে হাসে—অথচ তার নাম জাহান্নামীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।'

নাস্তার ট্রে হাতে ধীর পায়ে এগিয়ে যাই ড্রয়িং রুমের দিকে। হঠাৎ মনে হয় সবকিছু দুলছে। গ্লাসগুলো সামনে চলে যাচ্ছে। চায়ের জগটি পেছনের দিকে চলে আসছে। আমি শক্ত করে ট্রেটি ধরে রাখি। হাতদুটো কাঁপতে থাকে। কোনোভাবে ট্রেটি টেবিলে রাখতে সক্ষম হই।

এমন সময় বড় ভাইয়ার ডাক শুনতে পাই—মাইমুনা! এদিকে এসো দেখি। সসংকোচে ত্রস্ত পদে আমি এগিয়ে যাই। সোফায় বসতে গিয়েই আচানক চোখাচোখি হয়ে যায় আমাদের। আমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি। আশেপাশের কিছুই আর অনুভব করতে পারি না। বুকটা ধকধক শব্দ করতে শুরু করে। মনে হয় দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে এই আওয়াজ। অস্বস্তিতে কপাল ঘামতে থাকে। বড় ভাইয়া আর আমার বিয়ের প্রস্তাবকারী যুবকটি কথা বলছে আজকের আবহাওয়া নিয়ে—আজ বৃষ্টি হয়েছে; আবহাওয়া বেশ মনোরম ইত্যাদি। সহসা যুবকটি আমাকে প্রশ্ন করে বসে, 'কেমন আছেন আপনি?' লজ্জায় আমি এতটুকু হয়ে যাই। প্রশ্নের কোনো উত্তরই মনে আসে না। জিহ্বা যেন মুখে লেপ্টে আছে। নাড়ালেও যেন নড়ে না। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করি, 'আলহামদুলিল্লাহ'। কিন্তু এত অনুচ্চ আওয়াজ তারা শোনার কথা না। আমার পালিয়ে যেতে মন চাইল। কিন্তু পা-দুটো যেন ভীষণ ভারী। আমার

অস্বস্তি ও লজ্জার আতিশয্য দেখে তিনি কথার মোড় ভাইয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেন। ফিরে যান আগের প্রসঙ্গে। অনেক্ষণ পর আমি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসি। সামনে রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি পান করি। তিনিও পানি খাবেন বলে ইশারা করেন। তাই আরেক গ্লাস তার দিকে বাড়িয়ে দিই। আমি চলে আসার একটি সুযোগ পেয়ে যাই। দ্রুত আমি সটকে পড়ি তাদের সামনে থেকে। আমার ছোট বোন বলে, 'কী ব্যাপার? আপনি এমন করলেন কেন? এটি কি লজ্জার কারণে?' আমি বলি, 'তুমি কী মনে করো? প্রথম বারের মতো একজন গাইরে মাহরামের মুখোমুখি হলে তুমি কী করতে?'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

এক সপ্তাহ পর এক ব্যক্তি আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ড্রয়িং রুমে বসে তারা অনেক্ষণ আলোচনা করেন। যাওয়ার আগে তিনি আব্বুকে মোহর সোপর্দ করেন। আব্বু অনেক প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক। তিনি জিজ্ঞেস করেন :

- এগুলো কী বৎস?

- আফিফার মোহর।

- এতগুলো মোহর দিয়ে কী করবে আমার মেয়ে?

- জামা-কাপড় আর অলংকার কিনবে। (একটু দ্বিধার সঙ্গে বলেন তিনি)

আব্বু বিনয়ের সঙ্গে বলেন—'এগুলো মোহর'। এই বলে তিনি সেখান থেকে পরিমিত পরিমাণ গ্রহণ করেন এবং বাকিগুলো তাকে সোপর্দ করেন। তিনি বলেন, 'অলংকার আমার মেয়ে কিনতে জানে না। এগুলো আপনারা কিনবেন। জামা-কাপড় আমরা যা পারি ব্যবস্থা করব। এরপর থেকে পোশাক-আশাকের দায়িত্ব আপনাদের। বৎস! সে মেয়েই অধিক বরকতময়, যার মোহর কম হয়। মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়ে অনেকেই এসেছিল। আমরা তোমাকেই পছন্দ করেছি। আমাদের প্রত্যাশাগুলোকে মলিন হতে দিয়ো না। কথায় আছে না, "আমরা মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছি যাতে স্বামী তাকে ভালো রাখে আর মেয়ে স্বামীকে ইবাদত ও কল্যাণকর্মে সাহায্য করে।"'

সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। সবার অন্তরে বয়ে যায় খুশির জোয়ার। আমার মনেও চাপা আনন্দ। সেই সঙ্গে মা-বাবা ও ভাই-বোনদের ছেড়ে যাওয়ার বেদনা। সব মিলিয়ে মিশ্র অনুভূতি।

বড় ভাইয়া বলেন, 'যুবকটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মুখে যেন হাসি ফুটেই থাকে। অবয়বে কল্যাণের ছাপ সুস্পষ্ট। কখনো জামাতে সালাত তরক করে না। মা-বাবার খুব অনুগত। একই সঙ্গে দ্বীনদার ও চরিত্রবান। খুশি হওয়ার মতো গুণাবলি পর্যাপ্ত।' আমি সহজেই রাজি হয়ে যাই। আল্লাহর শোকর আদায় করি।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

এখনো অনেক কাজ বাকি। জামা-কাপড় কিনতে হবে। জীবনে কয়বার মার্কেটে গিয়েছি হাতের আঙুলে গোনা যাবে। এটি আমার কাছে সাক্ষাৎ আজাব মনে হয়। বিয়ে উপলক্ষ্যে এখন প্রতি সপ্তাহে একবার হলেও যেতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রয়োজনে।

বিয়ের প্রস্তুতির জন্য আমাদের কত আয়োজন! কত ব্যবস্থাপনা! কবরের জন্য কি এভাবে আমরা প্রস্তুতি নিই? আব্বু আর বড় ভাই রাত-দিন এক করে ফেলেছেন—এটা ওটা নিয়ে খোঁজখবর করছেন। কোথায় পাওয়া যায়? দাম কত?

মার্কেটের ফটক দিয়ে ঢুকলেই মনে হয় ফিতনার জগতে এসে পৌঁছেছি। লোকজনের অসহ্য ভিড়। কেনাকাটার সব বোঝা আমি বড় ভাইয়ার কাঁধে চাপাই। সাথে আমার ছোট বোনও আছে। তাকে বলি, 'খুব বেশি সময় খরচ হচ্ছে। আমাদের উচিত বিষয়টিকে গুছিয়ে আনা। কী কী কিনব তার একটি লিস্ট তৈরি করে ফেলো আর সময়েরও একটি হিসেব ঠিক করে নাও।' বড় ভাইয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে সে খুব দ্রুত একটি তালিকা তৈরি করে এবং সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে তার একটি সম্ভাব্য অবস্থান নির্দেশ করে। ফলে কেনাকাটার ব্যাপারটি আমাদের জন্য বেশ সহজ হয়ে আসে। আমি চাই না, আমার দাম্পত্য জীবন গুনাহের মাধ্যমে শুরু হোক। মনে মনে দোয়া করি, আল্লাহ যেন নাফরমানি থেকে আমাকে হিফাজত করেন।

পরের সপ্তাহে আরেক বার মার্কেটে যেতে হয়। প্রয়োজনীয় অনেক কিছু কিনি। একটি লিস্ট এনেছি এবার। আমি জানি কোন জিনিস কোথায় পাওয়া যায়। তাই খুব দ্রুত শেষ হতে থাকে কেনাকাটার পর্ব। একটি দোকান থেকে কিছু জিনিস কেনার ছিল। কাছে গিয়ে দেখি ভেতরে ঠাসাঠাসি অবস্থা। প্রতিটি কোনায় মেয়েদের ভিড়। প্রতিটি বিক্রয়কর্মীর সামনে একাধিক মহিলা দরদাম করছে। সবাই আবার মুসলিম নারী। কিন্তু মুসলিম নারীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেউ চুল বের করে দিয়েছে। কেউ মুখ খোলা রেখেছে। কেউ চেঁচিয়ে কথা বলছে। মনে মনে বলি, মুখ খোলা মেয়েটির সঙ্গে আমি কথা বলব—যে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করার ধান্দায় আছে। কাছে গিয়ে বলি, 'পর্দার বিধান লঙ্ঘন করছেন কেন—আপনি আখিরাতের পরিণামের ভয় করেন না? আপনি সুন্দর চেহারার অধিকারী। জাহান্নামের আগুনের ভয় কি আপনার জাগে না? স্মরণ করুন, একদিন আপনাকে কবরে শুয়ে দেয়া হবে। আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে। সেদিন কি জবাব হবে আপনার?' আমি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভিড় এত বেশি যে সেই সুযোগ নেই। তা ছাড়া আমি চেষ্টা করি, আমার আওয়াজ যেন সে ছাড়া আর কেউ না শোনে। একটি শান্ত ও নিরিবিলি জায়গা খুঁজি, যেখানে তার সঙ্গে কথা বলা যায়।

সহসা এক যুবককে আসতে দেখি। তার সঙ্গে সর্বাঙ্গ পর্দাবৃতা এক মহিলা। খুব সম্ভব তার স্ত্রী বা বোন হবে। মুখ-খোলা মেয়েটিকে দেখে সে মুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে বলে, 'বোন! আপনার জন্য পর্দা আবশ্যক। যদি চেহারাটা ঢেকে নিতেন, অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতেন।' তার কথা শুনে মেয়েটি ফোঁস করে রেগে যায়। কড়া ভাষায় বলে, 'আপনার কী সমস্যা?' যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সবাই তার দিকে তাকায়। দৃঢ় কণ্ঠে যুবকটি বলে ওঠে, 'বোন! আপনার কথা স্পর্শকাতর। এতে কুফরের আশঙ্কা আছে। আল্লাহর নাফরমানি করে কেউ সম্মান লাভ করতে পারে না। আপনি তাওবা করুন।' তারপর সে গলার স্বর নিচু করে ফেলে। মেয়েটির হিদায়াতের জন্য দোয়া করে এবং ধীর পায়ে প্রস্থান করে। ভেবেছিলাম এতটুকুতেই ঘটনা শেষ হয়ে যাবে—কিন্তু হয় না। মেয়েটি পেছন থেকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে যুবকটিকে লক্ষ্য করে—

‘ফালতু কোথাকার! বেকার লোকটার মনে হয় কোনো কাজকাম নাই। কেন অনধিকার চর্চা করছে? আজকাল সবাই উপদেশ শোনাতে উস্তাদ!’

এদিকে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি অন্য একটি বিষয়ে। যুবকটি কেন বলল ‘এতে কুফরের আশঙ্কা আছে।’ বড় ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, ‘আমি দেখে জানাব।’ কয়েক সপ্তাহ চলে যায়। ভাইয়া কোনো উত্তর দেন না। মনে মনে ভাবি, যুবকটি কি একটি কথা আন্দাজে বলে ফেলেছে? একজন মুসলিম যুবক কাউকে নসিহত করতে গিয়ে এমন কোনো কথা বলতে পারে, যা সে জানে না?

আমি সিদ্ধান্ত নিই, বিষয়টি আমি নিজেই যাচাই করে দেখব। অনেককেই জিজ্ঞেস করি। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাই না। এরপর বিয়ের ঝামেলায় বিষয়টি আমি ভুলে যাই। কয়েক মাস পর বিষয়টি আবার মনে পড়ে যায়। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, ‘যুবকটি ঠিক বলেছে। আমি পড়েছি বিষয়টি। তবে ঠিক মনে পড়ছে না কোথায় পড়েছি।’

এরপর অনেক দিন কেটে যায়। একদিন ‘হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন’[২৩] পড়ছিলাম। হঠাৎ মাসআলাটি পেয়ে যাই—‘যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীকে অনধিকারচর্চাকারী বলে সে মুরতাদ।’ সেখানে আরও বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশকারীকে অনধিকারচর্চাকারী বলবে তার কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।’ আমি ওই অংশটা বারবার পড়ি। মনে মনে বলি, মানুষ মূর্খতার কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে বেয়াদবি করছে। ইসলাম থেকে নিজের অজান্তেই দূরে ছিটকে পড়ছে।

সবর

“

‘জীবনে কখনো ঘনিয়ে আসে দুঃখের কালো রাত। বিরহের অশ্রুতে ভিজে যায় কোমল বালিশ। তাই সুখের সময় প্রস্তুতি নাও অনাগত দিনের। দুচোখ মেলে দেখে নাও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের। তাদের কাছ থেকে শিখো—অভিজ্ঞতা অর্জন করো। কোনো নতুন কি দেখেছ, যা পুরাতন হয় না? কোনো পরিচ্ছন্ন বস্তু কি দেখেছ, যা মলিন হয় না?’

জাহরা বড়ই আদরের। ছোট্ট একটি মেয়ে। কিন্তু হৃদয়ের যেন সবটাই জুড়ে থাকে। পাখির মতো কিচিরমিচির করে মাতিয়ে রাখে পুরো বাড়িটা। কচি হাতদুটো ওপরে তুলে দৌড়ে এসে এমনভাবে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে ওকে আদর না করে উপায় নেই। সজোরে বুকে চেপে ধরি। চুমু খাই তার নরম গালে। নাক ধরে টানাটানি করি। মাথার চুলগুলো নিয়ে খেলি। তার কোমল স্পর্শে স্নেহ আর ভালোবাসায় ভরে ওঠে আমার মাতৃহৃদয়। প্রাণভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। প্রাণপ্রিয় স্বামী, কলিজার টুকরো সন্তান, সুখের দাম্পত্য জীবন—সবই তো তাঁরই দান।

সেই দিনগুলোর কথা এখনো জ্বলজ্বল করে স্মৃতির পাতায়। আমি তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ি। পরিবারের লোকদের মুখে শুনি আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। আজ অনেক বছর হয়ে গেল আদিল আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। অনেক মেয়েরই স্বপ্ন ছিল তাকে পাওয়ার। অসাধারণ এক যুবক আদিল। যেমন দ্বীনদারি তেমনি সুন্দর আখলাক।

অবশেষে সমাপ্ত হয় প্রতীক্ষার প্রহর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার অব্যবহিত পরেই আমাদের আকদ হয়ে যায়। দুজনে মিলে আমরা সুখী

সমৃদ্ধ একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করি। নতুন এক জীবনের মুখোমুখি আমরা। বুকভরা স্বপ্ন। অনাগত দিনগুলোর প্রত্যাশা আমাদের সামনে পেশ করছিল সুখের নাজরানা।

বিয়ের কয়েক মাস পরেই তিনি চলে যান তার কর্মস্থলে—অনেক দূরে দেশের সীমান্তবর্তী একটি শহরে। কিছুদিন পর আমাকেও নিয়ে যান সেখানে। প্রথমে খুব মন খারাপ হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে দূর দেশে যেতে কার মন চায়? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে একজন আদর্শ স্বামীর কথা। তার বুকভরা ভালোবাসার কথা। তার মধুময় সান্নিধ্যের সুখস্বপ্ন মুহূর্তেই আমার হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে। আমি নির্দ্বিধায় দূর দেশে যেতে প্রস্তুত হয়ে যাই।

এমন উত্তম স্বামী কজন পায়? তার অপূর্ব দ্বীনদারি আর অনুপম চরিত্রে যে কেউ মুগ্ধ হবে। নিখুঁত ব্যবহার, নম্র আচরণ, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, নির্মল সরলতা আর নিপুণ সত্যবাদিতা সবাইকে কাছে টানে। দূরের শহরে তার মধুর সাহচর্য আমাকে ভুলিয়ে দেয় স্বজনদের বিরহ। যত দিন যায়—বাড়তে থাকে তার ভালোবাসা। ঘুমে জাগরণে সর্বত্রই তার সরব উপস্থিতি।

আমার হাত থেকে পানির গ্লাস কিংবা চায়ের কাপটি নিয়েই বলে ওঠে—'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।' সব কাজেই তার অপূর্ব শিষ্টাচার ও উত্তম আচরণ আমাকে বিমোহিত করে। একবার আমি বলি, 'আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না—এটি তো আপনার প্রতি আমার দায়িত্ব।' তিনি শুধু মুচকি হাসেন। কোনো উত্তর দেন না। তার চরিত্রের সৌন্দর্য আমাকে পুরোপুরি বেষ্টন করে নেয়। আমি প্রাণভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি—কত বরকতময় স্বামী তিনি আমাকে দান করেছেন। যিনি আনন্দে ভরে দিয়েছেন আমার প্রবাসের ধূসর দিনগুলোকে। আত্মীয়-স্বজনের অনুপস্থিতি আমাকে অনুভব করতে দেননি এক মুহূর্তের জন্যও।

একসময় আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি। আমার পেটে সাত মাসের বাচ্চা। এই সময়গুলোতে তিনি আমাকে কোনো কাজই করতে দিতেন না। এমন কোনো দায়িত্ব দিতেন না, যা আমার জন্য কষ্টকর। বরং আগেভাগে জিজ্ঞেস

করতেন—'তুমি কি দুর্বলতা অনুভব করছ? তুমি কি ক্লান্ত?' ব্যক্তিজীবনের আনন্দগুলো তিনি আমার সঙ্গে শেয়ার করতেন। খুলে বলতেন, হৃদয়ে লালিত স্বপ্নগুলোর কথা। প্রায়ই বলতেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন, আমি তার নাম রাখব বিলাল।' রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মুআজ্জিন বিলালকে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

গর্ভের শেষ দিনগুলো আমি অতিবাহিত করছিলাম। অবশেষে আল্লাহর রহমতে একটি মেয়ে শিশুর জন্ম হয়। আমরা তার নাম রাখি জাহরা। একদিন তিনি জাহরাকে আদর করছিলেন। আমি তাকে বলি, 'জাহরাকে পেয়ে কি আপনি খুশি—বিলালের স্বপ্ন তো আপনার পূরণ হলো না?' তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা-ই পছন্দ করেন, আমরা তার ওপর সন্তুষ্ট। পবিত্র কুরআনে এসেছে : (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"[২৪] আর যিনি আমাদের জাহরাকে দিয়েছেন, তিনি বিলালকেও দেবেন ইনশাআল্লাহ।'

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের ওপর সৌভাগ্যের ছায়া ক্রমশ বিস্তৃততর হতে থাকে। ভালোবাসার সবুজ বৃক্ষটিও নতুন নতুন পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। এই শহরে আগমনও আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার এক নিয়ামত হয়ে দেখা দেয়। এখানে বড় বড় শাইখদের দরস হয় একাধিক মাদরাসা ও মসজিদে। বিভিন্ন দ্বীনি মাহফিল ও সেমিনার হয়। মহিলাদের জন্য আয়োজিত একটি দরসে একবার আমার পরিচয় হয় এক মাদরাসার ছাত্রীর সঙ্গে। পরিচয় থেকে গড়ে ওঠে সখ্যতা। সে একবার আমাকে জনৈক শাইখের বয়ানের একটি ক্যাসেট উপহার দেয়। 'হে মেয়ে! হিজাব অথবা জাহান্নামের একটি বেছে নাও'—শিরোনামের ওই আলোচনাটি আমার খুব ভালো লাগে। এই বয়ানটি শুনে আমি পর্দার ব্যাপারে বেশ সতর্ক হয়ে যাই।

ফজরের আজান শুনেই আমার স্বামী বিছানা ত্যাগ করেন। আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তিনি মসজিদের দিকে রওনা হন। ঘর থেকে বের হবার সময় বলেন, 'আমি মাদরাসায় যাচ্ছি। মায়েরাই সন্তানদের শিক্ষক। আন্তরিকতার

২৪. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৪৯।

সঙ্গে সবকিছু গুছিয়ে রেখো। গিবত ও চুগলখোরি থেকে বেঁচে থেকো। কথায় কল্যাণ থাকলে কেবল তখনই মুখ খোলো। এমন কিছু বলে বোসো না, যার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাকে লজ্জিত হতে হয়।'

বাড়িতে প্রায়ই আমি বিভিন্ন শাইখদের বয়ান শুনি। সালাত ও তিলাওয়াতেই কাটে আমার অধিকাংশ সময়। জীবনটাকে বেশ গোছানো মনে হয়। সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে কানায় কানায় ভরা আমাদের দাম্পত্য জীবন। ভোরের সুরভিত হাওয়ায় যেন আন্দোলিত হয় আমাদের স্বপ্নগুলো।

একদিনের কথা। জোহরের সালাতের বেশ আগেই তিনি মাদরাসা থেকে ফিরে আসেন। তাকে দেখে খুব ক্লান্ত ও বিমর্ষ মনে হয়।

- কী হলো আপনার? অসুস্থ বোধ করছেন? (আমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা)

- আমি খুবই ক্লান্ত। প্রচণ্ডভাবে মাথা ঘুরছে।

আমি দ্রুত তাকে খাটে শুইয়ে দিই। দুপুরের খাবার প্রস্তুত করি। খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নড়াচড়াও করতে পারছেন না ঠিকমতো। আমি নিজ হাতে তাকে খাইয়ে দিই। বারবার জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কেমন বোধ করছেন?' তিনি বলেন, 'খুবই দুর্বলতা অনুভব করছি।' কিছুক্ষণ মাথা টিপে দিতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আসরের সালাতের সময় তাকে জাগাই। কিন্তু তার উঠে বসার শক্তি নেই। আমি তার প্রতিবেশী বন্ধুকে ফোন করি। তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এটিই ছিল তার জীবনের শেষের শুরু। ডাক্তার বলেন, 'আপনার স্বামীর মাথায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ব্রেইন স্ট্রোকের আশঙ্কা আছে।' আমি ভেঙে না পড়ে দৃঢ় থাকার চেষ্টা করি। আমি সালাতুল হাজত পড়ে দোয়া করি। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। আজ তিন দিন হয়ে গেল তার হুঁশ ফিরছে না। প্রতিদিন ভোরে আমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে হাসপাতালে চলে যাই। গভীর রাতে ফিরে আসি। হাসপাতাল বেশ কাছে বলে হেঁটে আসা-যাওয়া করা যায়।

ডাক্তারদের অনেক চেষ্টার পর শনিবার সকালে তার জ্ঞান ফিরে আসে। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। খুব কাছে গেলে তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থীদের চিনতেও

পারেন। আমি খুশিতে আত্মহারা। তাকে ফিরে পাওয়ার এক চিলতে আশা উঁকি দেয় হৃদয়ের গহীনে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—

- আদিল! আপনি আমাকে চেনেন?

- নাহ! আপনাকে চিনি না।

- জাহরাকে চেনেন?

- ও আমার মেয়ে।

- আমি জাহরার মা। (আমার কণ্ঠে দ্রুততা)

- তুমি আমার স্ত্রী। (তার মুখে আবিষ্কারের হাসি)

আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। কয়দিন আগেও কেমন সুস্থ ছিল আমার স্বামী। তার স্মৃতিশক্তি জ্ঞানবুদ্ধি সব ঠিক ছিল। অল্প কয়দিনে মানুষ এভাবে বদলে যেতে পারে! নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে চিনতে পারছে না!

অন্তহীন ভাবনায় ডুবে যাই। স্বামীহীন এক নারীর একমাত্র সঙ্গী এখন আল্লাহর জিকির। তিলাওয়াত করলে মনে কিছুটা শান্তি পাই। কুরআন যেন আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলে :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।’[২৫]

আরও একটি আয়াত পেয়ে যাই, যেটি আমার অনেক বড় সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায় :

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

---

২৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৩।

'আমি তোমাদের কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও সবরকারীদের—যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"'[২৬]

পরিবার-পরিজন থেকে আমি অনেক দূরে। এদিকে স্বামী অচল হওয়াতে আমি অনেক বড় মুসিবতে। হাসপাতালে আমি কার সঙ্গে আসা-যাওয়া করব। বাসায় একা একা কীভাবে থাকব—পিতা নেই, ভাই নেই, স্বামী নেই।

রবিবার যথারীতি আমি স্বামীর প্রতিবেশী বন্ধু ও তার স্ত্রীর সঙ্গে হাসপাতালে যাই। নিজেকে অনেক খুশি আর ভাগ্যবান মনে হয় সেদিন। আমার স্বামী আমাকে চিনতে পারেন। সবাইকে চিনতে শুরু করেন। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। কিন্তু কারও নাম মনে করতে পারেন না। আমাকে চেনেন—আমি তার স্ত্রী আর জাহরার মা। হঠাৎ তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকেন—'মাইমুনা...!' হাসিতে ভরে যায় তার মুখ। মনে হয়, আজকের মতো খুশি আমি আর কোনোদিন হইনি। এই প্রথম যেন তিনি আমার নাম ধরে ডাকলেন। আনন্দে অশ্রুসজল হয়ে উঠি আমি। প্রিয়তম স্বামী নাম ধরে ডেকেছেন আমায়—এই আনন্দ আমি কোথায় রাখি! তিনি বলেন, 'আমি অজু করব। সালাত আদায় করব।' পাশের মসজিদের আজানের শব্দে তিনি সচকিত হয়ে উঠেছেন।

সোমবার দিন তাকে একটি আলাদা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ভাইরাস নাকি তার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। শরীরের তাপমাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিন আমি পাঁচ ঘণ্টা তার পাশে থাকার সুযোগ পাই। আজ আমি নয় ঘণ্টা তার সঙ্গে কাটাই। ডাক্তারের পরামর্শে আমি তার হাত, পা ও কপালে পট্টি বেঁধে দিই। কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমে না। আমি তাকে শুনিয়ে কুরআন পড়তে শুরু করি। তিনি তন্ময় হয়ে শুনেন। কিছুক্ষণ পর পায়ের পট্টিটি বদলে দেয়ার জন্য কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করি। মুহূর্তেই

---

২৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৫-১৫৬।

তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আমি কুরআন শুনব।' আমি বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি। কোনো ক্লান্তিই আমাকে স্পর্শ করে না। একজন আলিম স্বামী মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন। তারই প্রিয়তমা স্ত্রী পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে। আর তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কী হতে পারে...!

মাগরিবের পরে তার এক প্রিয় বন্ধু তাকে দেখতে আসে। তাকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ। সালাম দিয়ে কম্পমান দুর্বল হাতটি বাড়িয়ে দেন মুসাফাহার জন্য। বন্ধুটি হাত বাড়ানোর বিষয়টি খেয়াল করেননি। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে আমিই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলি তার হাত। এটিই তার সঙ্গে আমার সর্বশেষ মুসাফাহা।

এরপর আমি বাসায় চলে আসি। মনটা একটু হালকা বোধ হয়। আবার আশঙ্কাগুলোও ঘনীভূত হতে থাকে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি।

মঙ্গলবার। সুবহে সাদিকের সফেদ রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে পুব দিগন্তে। মুআজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ফজর সালাতের আহ্বান—'আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার...। খুলে যায় আদিলের চোখ। শোয়া থেকে ধীরে ধীরে উঠে বসেন তিনি। জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ ঠায় চেয়ে থাকেন আসমানের দিকে। তারপর আবার শুয়ে পড়েন নীরবে। বন্ধ হয়ে আসে তার চোখ। ফিসফিস করে উচ্চারণ করেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তারপর ডান দিকে কাত হয়ে যায় তার মাথা।

সকালে হাসপাতালে এসে স্বামীর কেবিনে ঢুকার আগেই আমি খবর পেয়ে যাই। এক নার্স ছুটে এসে আমাকে বলে, 'আল্লাহ তাআলা আপনার স্বামীর ওপর রহম করুন। আপনাকে সবর করার শক্তি দিন।' আমি ইন্নালিল্লাহ পড়তে পড়তে কেবিনে প্রবেশ করি। ধবধবে সাদা চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছেন আমার স্বামী। কাছে গিয়ে মুখের কাপড়টা ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলি। উজ্জ্বল ফর্সা মুখাবয়ব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। মনে হয় না তিনি বেঁচে নেই। চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। আমি দু'হাতে মুখ চেপে বসে পড়ি চেয়ারে।

মুসিবতের বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। মনে মনে দোয়া করি—

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ! আমাকে এই মুসিবতের প্রতিদান দিন এবং এর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।'

আজ আদিল নেই। কিন্তু আদিলের রব আছেন। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনিই আমাদের নেগাহবান।
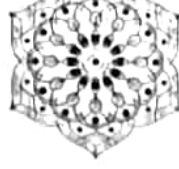
ইদের জামা

"

'যৌবন যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র। বিপুল সাহস আর অমিত তেজে সে মাড়িয়ে চলে সবকিছু। বিচিত্র তার জীবন। কখনো অসুস্থ হয় সে। নির্ঘুম কাটে তার রাত। পরদিনই সুস্থ হয়ে মাতিয়ে তুলে চারপাশ। কখনো বিপদের চোখে চোখ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে। ছিনিয়ে আনে বিজয় মুকুট কিংবা মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।'

রমজানের শেষ দশক চলছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে ইদুল ফিতর। কী করব কিছুই বুঝতে পারি না। তাই রে নাই রে না করে কাটে আমাদের দিন। বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তিবাজি, বাজারে বা মার্কেটে ঘোরাঘুরি কিংবা রাস্তায় টহল দেয়াই আমাদের নিত্যদিনের কর্ম। সারাটি রাত আমরা পার করে দিই আড্ডার আসরে।

সেদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহমানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তার মেরুন কালারের কারটি দেখা যায়। বেশ দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় সে। এমনভাবে ড্রাইভ করে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তার পাশের সিটে উঠে বসতেই জিজ্ঞেস করে :

- ইদের জামা-কাপড় কিছু কিনেছিস? ইদ তো এসেই গেল।

- নাহ!

- চল.. তাহলে দর্জির দোকানে যাই। এখনই...

- তোর মাথা খারাপ! ইদের আর তিন কি চার দিন বাকি। এত অল্প সময়ে তোকে জামা বানিয়ে দেবে কে? রেডিমেট কিনতে পারিস।

সে এমনভাবে একটা ভাব করে যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি—কিংবা শুনতে পেলেও এমন অর্থহীন কথার উত্তর দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সে মার্কেটের দিকে যেতে থাকে। একসময় একটি বড় দর্জির দোকানের সামনে এসে কড়া ব্রেক কষে। বিশ্রী একটি শব্দ তুলে থেমে যায় গাড়ি। দ্রুত নেমে সে দর্জির দোকানে প্রবেশ করে—যেন খুব বেশি তাড়া আছে তার। বেশ কায়দা করে সালাম দেয় দর্জিকে। আগেও সে এসেছে এই দোকানে। দর্জির সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। কোনো ভূমিকায় না গিয়ে সে বলে, 'এবারের ইদটা একটু জমিয়ে উদযাপন করতে চাই। নতুন জামা দরকার।' দর্জি মুচকি হেসে বলে, 'ইদের বাকি আর কয়দিন আছে জানেন? তাড়াতাড়ি আসেননি কেন?' আব্দুর রহমান ডান হাতটা নেড়ে অদ্ভুত একটি ভঙ্গি করে—যেন দর্জির পুরো কথাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'আপনাকে এত বেশি মূল্য দেবো আপনি খুশিতে রাজি হয়ে যাবেন। আগামী পরশু আমার জামা চাই।' সে আবার জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করে, 'আগামী পরশু...। খেয়াল রাখবেন কিন্তু।' কাপড় নির্বাচন করে জামার মাপ দিয়ে আমরা চলে আসি। বের হওয়ার পূর্বে আব্দুর রহমান আবার বলে, 'জামা ডেলিভারির সময় ভুলে যাবেন না।'

সারা রাত আড্ডা ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নেই। সাহরির সময় পর্যন্ত আমরা নির্ঘুম রাত কাটাই। একটি বার আল্লাহর নাম নেব সেই তাওফিকও আমাদের হয় না। এমনকি লাইলাতুল কদরেও একই অবস্থা।

মাঝে মাঝে জীবনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। হৃদয়ের কোথাও যেন জমে আছে জমাট অন্ধকার। গুনাহের প্রতিটি দরোজায় আমরা করাঘাত করি। বিচরণ করি নাফরমানির প্রতিটি ময়দানে। আশপাশ কাঁপিয়ে ফেটে পড়ি অট্টহাসিতে। আমরা কতটা খুশি আর ভাগ্যবান সেটা প্রকাশ করতে মোটেই কার্পণ্য করি না। কিন্তু আমাদের আসল রূপ কেউ জানে না। একটু নির্জনতা পেলেই অদ্ভুত এক বিষণ্নতা আমাদের কুরে কুরে খায়। বুকটা চিনচিন করে ওঠে অজানা সব কষ্টে। হতাশার গ্লানি আমাদের টুঁটি চেপে ধরে। হয়তো এই বিভীষিকাগুলোকেই আমরা হাসি-ঠাট্টার আড়ালে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

আমরা পারতপক্ষে একা থাকি না। বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কোনো দিন আমরা কল্পনা করতে পারি না। সারা রাত এক সঙ্গে কাটিয়ে ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে যার যার বাড়ি রওনা হই। পুরো দিনটা কেটে যায় ঘুমে ঘুমে। সেই যে সাহরি খেয়ে ঘুমোই, জেগে উঠি আসরের সময়। সাওম পালন করি, কিন্তু সালাত আদায় করি না। আদায় করলেও তা কেবল ওঠা-বসা। প্রাণহীন এই সালাত আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছুই নয়। আসরের পরের সময়টাও কাটে বাজে সব কাজকর্মে। মোবাইলে অহেতুক গল্পগুজব কিংবা বিদঘুটে ম্যাগাজিন পড়ে।

সেদিন ইফতার করে সবে উঠেছি—হঠাৎ আব্দুল্লাহর ফোন পাই। রিসিভ করতেই সে বলে :

- সালমান তুই কোথায়?

- আমি বাসায়। কেন? কিছু হয়েছে? তোর কণ্ঠ অমন বিষণ্ন শোনাচ্ছে কেন?

- খবর পাসনি, আব্দুর রহমান অসুস্থ...?

- কী বলিস? গতকালই তো আমরা দোকানে জামা বানাতে দিয়ে এলাম!

- অসুস্থ সে। খবর নিয়ে দেখ। আমরা আসছি ওকে দেখতে।

এই বলে ফোন কেটে দেয় সে। আমার কাছে খবরটি অর্থহীন মনে হয়। হয় তো ভুল শুনেছে সে। আব্দুর রহমানকে ফোন দিই। কেউ রিসিভ করে না। কয়েক বার চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিই। একটু সন্দেহ জাগে মনে। এমন সময় অপরিচিত নাম্বার থেকে একটি কল আসে। রিসিভ করতেই বলে :

- তুমি কি সালমান?

- জি, আমি সালমান। বলুন।

- আমি আব্দুর রহমানের বড় ভাই।

আমি ভয় পেয়ে যাই। আমাদের ব্যাপারে তার কাছে কোনো অভিযোগ গেছে কি না কে জানে। সারাদিন কত অপকর্ম করে বেড়াই। একটু থেমে তিনি বলেন :

- আব্দুর রহমান মারা গেছে। (শীতল অশ্রুভেজা তার কণ্ঠ)

এই বলে তিনি ফোন কেটে দেন। আমি হঠাৎ যেন পাথর হয়ে যাই। কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। এখনো চোখের সামনে ভাসছে আব্দুর রহমানের চেহারা। কানে গুঞ্জন তুলছে তার দুষ্টুমির আওয়াজ।

পরে বিস্তারিত খবর পাই। জোহরের সময় গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। হঠাৎ একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় সে। আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কিন্তু এসব খবরের কিছুই আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। জেগে উঠলেই হয়তো দেখব হাসতে হাসতে আব্দুর রহমান আমার দিকে আসছে। আগামীকালই দর্জির দোকান থেকে তার জামা আনার কথা...!

আব্দুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যু হৃদয়টা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। একটি বড় পর্দা যেন সরে যায় আমার দৃষ্টি থেকে। গভীর ঘুম থেকে যেন কেউ জাগিয়ে তোলে আমাকে।

আব্দুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নেই। মৃত্যু এক তিক্ত বাস্তবতা। আব্দুর রহমান দর্জিকে বলেছিল, আগামীকাল জামার জন্য আসবে। অথচ সে আজ কবরে। সে নিয়ত করেছিল ইদের পোশাকের—নিয়তি তাকে সাজিয়ে দিল সাদা কাফনে।

আমি ঠায় বসে থাকি। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো গুছিয়ে আনার চেষ্টা করি। মাথায় এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। সিদ্ধান্ত নিই—আব্দুর রহমানের বাড়িতে যাব। তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়া দরকার। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতেই হঠাৎ চোখ চলে যায় ড্যাশবোর্ডের দিকে। একটি গানের ক্যাসেট পড়ে আছে ওখানে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে ক্যাসেটটি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলি। রেডিও অন করে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে শুরু করি। ইমামুল হারামের অসাধারণ তিলাওয়াত মন ছুঁয়ে যায়। ইস! এতদিন কোথায় ছিলাম আমি? এই পবিত্র উচ্চারণ থেকে আমি কেন কল্যাণ লাভ করিনি এতদিন? শিরশির করে ওঠে পুরো শরীর। দেহের লোমগুলোও যেন তন্ময়

হয়ে শুনছে সুমধুর তিলাওয়াত। সহসা মনে হয়, পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে আশেপাশের সবকিছু। বোধ হয় এই প্রথম বারের মতো আমি কুরআন শুনছি। আর ড্রাইভ করতে পারি না। রাস্তার এক পাশে পার্ক করে সিটে গা এলিয়ে দিই। খোলা আসমানের অসীম নীলিমায় আটকে থাকে দৃষ্টিরা। পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘ থরে থরে জমে আছে আকাশে। পবিত্রতার এক নির্মল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওখানে। ইস! আমার জীবনটা যদি এমন শুভ্র হতো—পবিত্রতা যদি আমায় ঘিরে রাখত।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

প্রিয় বন্ধু আব্দুর রহমানের মৃত্যু আমূল বদলে দেয় আমার জীবন। খালিস দিলে তাওবা করি। চোখের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় অন্ধকার অতীত। একসময় যাদের আমি ঘৃণা করতাম, এখন তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। একসময় যাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতাম, এখন তারাই আমার কাছে সম্মানের পাত্র। তাদের সান্নিধ্যে থাকা সময়গুলো আমি বেশ উপভোগ করি। গোমরাহির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আল্লাহর রহমত আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছে।

বেশি দিন যায়নি—নতুন জীবনের অপূর্ব আনন্দে আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে। অন্তরে নেমে আসে প্রশান্তির সয়লাব। আসমানের মতো উদার হয়ে ওঠে মন। অভূতপূর্ব সব সৌভাগ্য জড়িয়ে ধরে আমায়।

অনেক দিন পর কি মনে করে আমি ওই দর্জির কাছে যাই। তাকে আব্দুর রহমানের কথা বলি। সব শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমাকে তার জামাটি বের করে দেন। অনুরোধ করেন, আমি যেন সেটি তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিই। জামাটি দেখে বুকটা হুহু করে কেঁদে ওঠে। একে একে মনে পড়তে থাকে আব্দুর রহমানের অমলিন স্মৃতিগুলো। বারবার প্রশ্ন করি নিজেকে—সত্যিই কি আব্দুর রহমান নেই?

প্রাণভরে দোয়া করি, হারানো বন্ধুটির জন্য। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তার মৃত্যু আমার জীবন বদলে দিয়েছে। হয়তো বাকি জীবনটুকু কাজে লাগিয়ে আমি অতীতের ভুলগুলো মুছে ফেলার সুযোগ পাব। হঠাৎ মনে পড়ে, আমার অন্যান্য বন্ধুর কথা! তারাও তো এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে অন্ধকারে। আলো থেকে তারা কত দূরে! মনের অজান্তেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায় আমার হাত। নাহ! এদেরকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওদেরকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। নিশ্চিত আগুনের দিকে তারা ছুটে চলেছে। আল্লাহ আমাকে যেমন হিদায়াত দান করেছেন, তাদেরও দান করবেন ইনশাআল্লাহ। আমার নতুন এক দ্বীনদার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ছুটে যাই লাইব্রেরিতে বই কিনতে...।

আসমানের দরোজা

“

জনৈক সালাফ বলেন, ‘পরিবার-পরিজনের জন্য কষ্ট ও সাধনা এমন কিছু গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, যা অন্য কিছুতে হয় না।’

আমার ছেলে আব্দুল্লাহ। খুব চঞ্চল ও প্রাণবন্ত এক শিশু। পুরো বাড়িটা সে মাতিয়ে রাখে সারাটা দিন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই শুরু হয় তার খেলাধুলার পর্ব। চিৎকার, চেঁচামেচি আর হইচই করে কাটে তার সময়। মা-বাবা আর দাদা-দাদির আদরে তার শৈশব কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

গতকাল থেকে হঠাৎ শান্ত হয়ে এসেছে আব্দুল্লাহ। চেহারায় আগের সেই উৎফুল্ল ভাব নেই। কপালে হাত দিয়ে দেখি শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। মুখের হাসি কোথায় হারিয়ে গেছে। ছোটাছুটিও বন্ধ। হাঁটার ভঙ্গিতে দুর্বলতার চিহ্ন। চোখের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত। কথা বলছে থেমে থেমে। ঘরের কোনায় লুকিয়ে থাকতে পারলেই যেন সে স্বস্তি পায় এমন একটা ভাব।

অবস্থা দেখে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ি। জ্বরের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে দেখে দ্রুত তার মাথায় জলপট্টি বেঁধে দিই। ডাক্তার দেখানোর আগ পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা তো করতে হবে। কিন্তু তার অবস্থা খুব দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে। জ্বর তীব্রতর হয়ে ওঠে। হাসপাতালে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখি না। কোন হাসপাতালে নেয়া যায়? জরুরি বিভাগে ভর্তি করাতে হবে। এদিকে আমিও ছুটিতে আছি। কোনো সমস্যা হবে না। অবশেষে দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে আব্দুল্লাহকে কোলে করে বেরিয়ে পড়ি হাসপাতালের উদ্দেশে। স্ত্রীকে বলি, ‘ভয় পেয়ো না। সব শিশুরই এমন

হয়। এরা তাড়াতাড়ি যেমন অসুস্থ হয়, আবার দ্রুত সেরেও ওঠে। আল্লাহর ওপর ভরসা করো।'

হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে মানুষের ভিড়। হাঁটতেও রীতিমতো কষ্ট হয়। এ যেন নতুন এক জগৎ। মানুষ যে কত কষ্টে আছে এখানে এলে কিছুটা আঁচ করা যায়। কত রকমের রোগ আর রোগী যে হতে পারে—আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। কারও মাথায় ব্যান্ডেজ। কেউ ভাঙা হাতদুটো কোলে নিয়ে বসে আছে। সারি সারি বেডে শুয়ে আছে অনেকগুলো অসুস্থ মানুষ। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে আর্তনাদের আওয়াজ। এক ধরনের কটু গন্ধ ছড়িয়ে আছে সবখানে। কিছুক্ষণ পর পর অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন সবাইকে সচকিত করে তোলে। অবস্থা দেখলে মনে হয়, পৃথিবীতে সুস্থ মানুষ আছে কি না সন্দেহ। দূরে এক কোণে দেখি এক বৃদ্ধ চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে। বয়স বোধহয় আশি পার হয়েছে। রাজ্যের সব হতাশা নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। চারদিকে মানুষের ছোটাছুটি। কেউ ওষুধের জন্য যাচ্ছে। কেউ হাতে ওষুধ নিয়ে ফিরছে। সাদা জামা পরা নার্সরা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোগীদের উৎকণ্ঠিত প্রিয়জনদের বিষণ্ন চেহারা দেখলে খুবই মায়া লাগে। এখানে না এলে বোঝাই যেত না, সুস্থতা আল্লাহর কত বড় নিয়ামত। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের দেখে আব্দুল্লাহর অসুস্থতাকে আমার তুলনামূলক হালকা মনে হয়।

ডাক্তার আব্দুল্লাহকে মনোযোগ সহকারে দেখেন। অনেক ধরনের ওষুধ দেন। হাসপাতালের বাইরে বিশাল এক ফার্মেসি থেকে ওষুধগুলো কিনে আমি বাড়ির দিকে রওনা হই। সুস্থতার নিয়ামতকে আজকের চেয়ে ভালোভাবে আমি কোনো দিন উপলব্ধি করতে পারিনি।

পরদিন আব্দুল্লাহর অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে যায়। কিন্তু কয়েকদিন পর ওষুধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বর চলে আসে। তাকে নিয়ে পুনরায় ডাক্তারের কাছে যাই। আব্দুল্লাহর অবস্থা খুলে বলি। তিনি বলেন, 'ভয় পাবেন না। ভালো হয়ে যাবে। একটু সময় নিচ্ছে আর কি।' এই বলে তিনি পূর্বের ওষুধগুলোই বহাল রাখেন। আমি খুশি মনে বাসায় ফিরে আসি।

যথারীতি ওষুধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বর আসে তার। আবার যাই ডাক্তারের কাছে। এভাবে টানা পাঁচ সপ্তাহ তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করি। কিন্তু কোনো উন্নতি নেই। এদিকে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। খানাপিনাও ছেড়ে দিয়েছে। আমার মনে ভয় ধরে যায়। তার মাও মুষড়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে আব্দুল্লাহ। কিছুই খেতে চায় না। হাঁটার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে সে। তার মা খেয়াল করে, তার শরীরের রঙ হলুদ হয়ে আসছে। এরপর আর বসে থাকা যায় না। তাকে নিয়ে আমি বিশেষায়িত হাসপাতালে চলে যাই। ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। তার ব্যাপারে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন আমাকে। আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, 'এই ধরনের রোগ কেবল ওষুধ খেলে সারবে না। দ্রুত রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। অপারেশন করার প্রয়োজন পড়তে পারে।' ডাক্তারের কথা শুনে বিষয়টি আমার বেশ গুরুতর মনে হয়। এতদিন দেরি করা ঠিক হয়নি। আমি আব্দুল্লাহকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরি। কপালে চুমু খাই। তার দুর্বল শরীর লেপ্টে থাকে আমার গায়ে।

কর্তব্যরত ডাক্তারদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তাকে অ্যানেস্থিসিয়া বিভাগে নিয়ে যাই। তার শরীরে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন পুশ করা হয়। ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে তার দুর্বল দেহ। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সে। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপে। আমার কিছুই করার নেই। দু'হাতে তাকে শক্তভাবে চেপে ধরি। অসহায় চোখে সে আমার দিকে তাকায়। চোখ দেখে মনে হয় আমার সাহায্য চাচ্ছে সে। অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে আমার হাতে। মনে হয়, চোখের ভাষায় সে আমাকে বলছে, 'আব্বু! এই নিষ্ঠুরতার কী অর্থ? কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?' প্রিয় সন্তানের এই ব্যথা আমার বুকে তীক্ষ্ণ শেলের মতো এসে বিঁধে। মোচড় দিয়ে ওঠে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়। মনে মনে বলি, কলিজার টুকরো আমার! তোর এই চোখের পানি আমার বেদনার দরিয়ার কয়েক ফোঁটামাত্র। বাপ আমার! আমি মূর্তি নই। পাথর হয়ে যায়নি আমার হৃদয়।

কয়েক দিন চলে যায়। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি পড়ে থাকি হাসপাতালে। যখনই কোনো ডাক্তার আসে মরিয়া হয়ে রোগের অবস্থা জানতে চাই। তাদের উত্তর শুনে মনটা দমে যায়। একটু আশার কথা শুনতে মন চায়। দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও তারা রোগ ধরতে পারে না। সংক্ষেপে জানায়, ছেলের সমস্যা রক্তে।

এদিকে তার শরীর দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। এমনকি সে শোয়া থেকে উঠে বসতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। চেহারার দিকে তাকালেই আশঙ্কায় আঁতকে ওঠে বুকটা। তার চোখে একটাই প্রশ্ন—'আব্বু! আমাকে এখান থেকে বের করবে না? ওরা আমাকে কত কষ্ট দিচ্ছে তুমি দেখো না? তুমিও ওদের সাথে মিলে আমাকে ব্যথা দিচ্ছ কেন?'

একবার এক ডাক্তার তার সহকর্মীকে বলেন, 'শিশুটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর রক্তস্বল্পতা দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও একে রক্ত দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এখন রক্ত দিলে সেটা পরীক্ষায় প্রভাব ফেলবে।' কাছে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনি। অজানা আশঙ্কায় বুকটা ধক করে ওঠে।

পরের দিন ডাক্তাররা আমাকে জানায়, তার বড় ধরনের একটি অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমে অস্থি মজ্জা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কারণ এখান থেকেই রক্ত তৈরি হয়। আমি সম্মত হই। সম্মত না হয়েই বা উপায় কী। তাকে তো বাঁচাতে হবে।

ডাক্তাররা চলে গেলে তাকে কোলে নিয়ে আদর করি। ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিই। তার স্পর্শে অন্তরটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। সে চোখ বন্ধ করে অনুভব করে আমার আদর। চোখের পাতাগুলো কাঁপতে থাকে অনবরত।

বিকেলে ডাক্তাররা আবার আসে। তাকে অজ্ঞান করে তার অস্থিমজ্জার (Bone Narrow) নমুনা সংগ্রহ করে। আমাকে বলে, বিশেষায়িত কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে এটি পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট আনতে। নমুনা নিয়ে আমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ি। বারবার আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি। জীবনের সব আনন্দ হঠাৎ করে দল বেঁধে যেন কোথাও হারিয়ে যায়। ঘুমের স্বাদ পাই না আজ কত দিন হয়ে গেল!

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে আমি নমুনা জমা দিই। মনে মনে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করি। হয়তো এই পরীক্ষার পর আমার সন্তান সুস্থ হয়ে উঠবে। অবসান ঘটবে তার এত দিনের কষ্টের।

পরের দিন রিপোর্ট আসার কথা। সময়গুলো কেমন যেন ধীর গতিতে চলছে। দুনিয়ার কোনো কিছুর খবর আমার নেই। সব চিন্তা জুড়ে আছে ওই রিপোর্টের সঙ্গে। জোহরের পরেই আমি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ফোন পাই। দ্রুত গিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসি। প্রাণভরে দোয়া করতে থাকি—সবকিছু যেন ভালো হয়।

কল্পনায় কান পাতলে এখনো শুনতে পাই তার উচ্ছ্বাসিত হাসি। দৌড়ে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। আমার পিঠে বসার সেই ভঙ্গি, আমার কপালে চুমু খাওয়ার সেই অনুভূতি এখনো যেন লেগে আছে মনে। বেশি খুশি হলে সে একটি শব্দ বলত...। হঠাৎ ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। শরীরটা শিরশির করে ওঠে। দুচোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা।

রিপোর্ট পড়ে ওখানকার ডাক্তাররা জানায়, তার Leukemia হয়েছে। এটি শ্বেতকণিকা আধিক্যঘটিত এক প্রকার মারাত্মক রোগ। ডাক্তারদের কথা শুনে আঁধার হয়ে যায় সম্মুখের পৃথিবী। দুশ্চিন্তা আর পেরেশানিতে অস্থির হয়ে উঠি আমি। দুপায়ের চলৎশক্তিও যেন ফুরিয়ে আসে।

মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। হয়তো আব্দুল্লাহকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানাতে হবে আমাকে। খবরটি কীভাবে আমি তার মা ও বোনকে দেবো? আমি নিজেই-বা কীভাবে তার দিকে তাকাব? বিদায়ী দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ করে আমি কি স্থির থাকতে পারব? আমি আর ভাবতে পারি না। শুধু জানি আমাকে সবর করতে হবে। সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকদিরের ওপর। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হই। জানি না আব্দুল্লাহ এখনো বেঁচে আছে, নাকি চলে গেছে আমাদের ছেড়ে। আজ তার মা যদি তাকে দেখতে আসে, তাকেই-বা কী জবাব দেবো?

হাসপাতালে ফিরে দেখি আব্দুল্লাহর চেহারা পূর্বের চেয়েও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা ঘিরে আছে তার বেড। সময় যেন কাটতেই চায় না। এক একটি ঘণ্টাকে মনে হয় একেকটি বছর। আগামীকাল ইদুল আজহা। ডাক্তার বলেন, কয়েক দিনের জন্য তাকে বাসায় নিয়ে আসতে। ওষুধপত্র নিয়ে আমি বাসার দিকে রওনা হই। অপারেশন কবে হবে, তার কিছুই জানাল না তারা। অপারেশন কি তাহলে হবে না? তারা কি নিরাশ হয়ে পড়েছে? কী আর করা। এখন তাদের কথামতো অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

অদ্ভুত এক ইদ কাটে আমাদের। দুঃখের চাদর জড়ানো এই ইদ যেন কারও জীবনে না আসে। আমি সবর করি। মুসিবতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের প্রত্যাশা করি। তার মাকে এত কিছু জানাইনি। সান্ত্বনা দিয়েছি। তবুও বাচ্চার অবস্থা দেখে সে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। পাগলের মতো হয়ে গেছে সে।

ইদের দ্বিতীয় দিন। বাচ্চাদের হাসি ও কোলাহলের শব্দ এসে কানে বাজে। ইদের খুশির আমেজ এখনো কাটেনি। সবাই আনন্দ করছে। কিন্তু আব্দুল্লাহর অবস্থা ভিন্ন। সে পড়ে আছে বিছানায়। আমি তার পাশে গিয়ে বসি। নড়ার শক্তিও নেই তার। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে অনেক কষ্টে চোখ খুলে সে। একরাশ বিষণ্ণতা ঝরে পড়ে তার দৃষ্টিতে। মনটা কেঁদে ওঠে হুহু করে। বুক চেপে ধরে বসে থাকি আমি।

ইদের দুদিন পর তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে যাই। ডাক্তাররা বিশেষ পদ্ধতির চিকিৎসা শুরু করে। তারা ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ও ওষুধ তার শরীরে পুশ করে। তিন বছর নাকি টানা এই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। রক্ত পরিশোধনের জন্য এ ছাড়া নাকি আর কোনো উপায় নেই।

চিকিৎসার প্রথম মাস আব্দুল্লাহ প্রায় ঘুমিয়েই পার করে। ওষুধের চাপ সহ্য করতে যাতে তার কষ্ট না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। এক মাস পর আব্দুল্লাহর অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়। সে আস্তে আস্তে হাঁটতে পারে। তবে পা

কাঁপতে থাকে বলে খুব একটা সুবিধা করতে পারে না। হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে থাকতে আমার বেশ কষ্ট হয়। ওদিকে তার মা ও বোন একা একা বাসায় পড়ে আছে। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা বলেন, এখন থেকে বাকি চিকিৎসা আমাদের শহরেই করা যাবে। তাই আমি আব্দুল্লাহকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হই। আব্দুল্লাহর চোখ দেখে মনে হয়, সে বলছে, 'আব্বু আমাকে নিয়ে আবার কোথায় চললে? অন্য কোনো হাসপাতালে? আম্মুকে দেখতে খুব মন চায়?'

দ্বিতীয় মাসে তার অবস্থা আরও ভালোর দিকে যায়। প্রতি সপ্তাহে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। সন্তানের সুস্থতা দেখে খুশিতে তার মায়ের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি! হঠাৎ তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে যায়। নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেই রোগটি। বাধ্য হয়ে আবার হাসপাতালে ছুটতে হয়। ডাক্তাররা বলেন, 'চিকিৎসাটি আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। নইলে বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে না।' নতুন করে আবার রক্ত পরীক্ষা করা হয়। ডাক্তার রিপোর্ট দেখে যেন চমকে ওঠেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন, 'আপনি চাইলে এখানেই চিকিৎসা শুরু করতে পারি। তবে সবচেয়ে ভালো হয় তাকে জিদ্দা নিয়ে গেলে।' আমি বলি, 'তাহলে জিদ্দা নিয়ে যাই।' হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় ডাক্তার বলেন, 'বাচ্চার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মোটেও অবহেলা চলবে না। খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

খুব দ্রুত জিদ্দা চলে আসি। আবার সেই চিকিৎসা শুরু হয়। এত ইনজেকশন তার শরীরে পুশ করা হয় যা বয়স্ক মানুষেরাও সহ্য করতে পারবে না। ইনজেকশন মারা হয়নি এমন জায়গা তার দেহে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যথায় সে কঁকিয়ে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদবে সে শক্তিটুকুও তার আর অবশিষ্ট নেই। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে সে আমার হাত ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি এক অসহায় বাবা। কিছুই করার নেই আমার।

আশার সব দরোজা যেন বন্ধ হয়ে যায়। সহসা মনে হয় একটি দরোজা এখনো খোলা আছে—আসমানের দরোজা। এটি সব সময় খোলা থাকে। মনে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে এক চিলতে আশার আলো। মুহূর্তেই ফিরে

আসে মনোবল। নিজের এই আশ্চর্য পরিবর্তনে নিজেই আশ্চর্য হই। আলহামদুলিল্লাহ! আমি মনে শক্তি সঞ্চার করি। আমাকে সবর করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾

> 'বলো তো কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদাপদ দূরীভূত করেন।'[২৭]

এই দিনগুলোতে আমি একজন শাইখের খবর শুনি, যিনি কুরআনি চিকিৎসা করেন। কয়েক জন দ্বীনদার আত্মীয় পরামর্শ দেন, আমি যেন আব্দুল্লাহকে তার কাছে নিয়ে যাই। কুরআনে শিফা আছে। মনে নানান ধরনের সন্দেহ ও সংশয় এসে ভিড় করে। এই আধুনিক প্রত্যক্ষ চিকিৎসা কীভাবে আমি ছাড়তে পারি? শাইখের কাছে যাওয়ার পূর্বে আমি ইসতিখারা করার সিদ্ধান্ত নিই। সেদিন রাতে স্বপ্নে দেখি, আমি একটি সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। তীরের কাছাকাছি পানি বেশ অগভীর। একটি জায়গা উঁচু হওয়াতে সেটি পানির ওপরে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই উঁচু অংশের মাটিতে একটি গর্ত দেখা যায়। সেখান থেকে একটি কাঁকড়া বের হয়ে দূর সমুদ্রের দিকে রওনা হয়।

ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি ভাবতে থাকি। কী দেখলাম এসব? এক দ্বীনদার বন্ধুকে ফোন করে সব জানাই। তিনি বলেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো। ইনশাআল্লাহ! আব্দুল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। ওই যে তুমি মাটি দেখেছ, সেটি হলো বনি-আদম। আর কাঁকড়াটি হলো রোগ। সেটিই বেরিয়ে দূরে চলে গেছে।'

স্বপ্নের তাবির শুনে মনটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। খুব দ্রুত আমি শাইখের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। কুরআনি চিকিৎসায় ইনশাআল্লাহ আমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

শাইখের ঘরে রোগীদের প্রচণ্ড ভিড়। তবুও সেখানে এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভূত হয়। উপস্থিত রোগীদের সঙ্গে কথা বলি। তারা শাইখের

---

২৭. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।

চিকিৎসার অনেক সাফল্যের কথা শোনায়। স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় আমার মন ভরে ওঠে। অবশেষে শাইখের কাছে যাওয়ার সিরিয়াল আসে। আমি আব্দুল্লাহকে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে তার সামনে গিয়ে বসি। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়ফুঁক করেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে তিনবার আমার কাছে আনতে হবে তাকে।' তিনি আমাকে কিছু কুরআনের আয়াত শিখিয়ে দিয়ে বলেন, 'এগুলো নিয়মিত পড়ে তাকে ফুঁক দেবেন।' আমি আপাতত হাসপাতালের চিকিৎসা বন্ধ করে দিই। কারণ ওখানে তার মূল চিকিৎসা শুরু হয়ে গেলে আর বের করা যাবে না।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই আব্দুল্লাহর অবস্থা আমূল বদলে যায়। আলহামদুলিল্লাহ! সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তিন সপ্তাহ পর আমি হাসপাতালে যোগাযোগ করি। কর্তৃপক্ষ জানায়, সিট খালি হলে তারা জানাবে। তিন দিন পর তারা ফোন করে বলে, 'সিট খালি হয়েছে।' আমি আব্দুল্লাহকে নিয়ে হাসপাতালে যাই। যথারীতি তারা নমুনা সংগ্রহ করে আমাকে দেয়। ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে যেতে আমি দোয়া করি, 'আল্লাহ! এরপর যেন আমাকে আর হাসপাতালে আসতে না হয়।' পরদিন বুকে প্রবল আশা নিয়ে রিপোর্ট আনতে যাই। ডাক্তারের হাতে রিপোর্ট জমা দিতে গিয়ে ধুকপুক করে ওঠে আমার বুক। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করি তিনি কী বলেন শোনার জন্য। তার উচ্চারিত শব্দগুলো যেন আমার কানে সুধা বর্ষণ করে—'আপনার সন্তান সুস্থ।' আনন্দে আমি কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলি। দুচোখ চকচক করে ওঠে অশ্রুতে। এত খুশি জীবনে আমি কোনো দিন হইনি। আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি। প্রাণভরে শুকরিয়া আদায় করি করুণাময়ের।

আব্দুল্লাহকে বুকে লুকিয়ে আমি হাসপাতাল থেকে বের হই। তার মাকে ফোন করতে গিয়ে আনন্দে আমি কেঁদে ফেলি। তুমি মহান হে আমার রব! প্রজ্ঞাময় তুমি হে আল-কুরআন।

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

> 'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করব, বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কুরআনই সত্যি। এটি কি তোমার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?'[২৮]

এই আয়াতটির বাস্তবতা আমি নিজের মধ্যে দেখেছি। দেখেছি পরীক্ষার রিপোর্ট আর আব্দুল্লাহর কষ্টের মাঝে। দেখেছি তার মায়ের ব্যথাতুর চেহারায়। আল্লাহ তাআলা সত্যিই বলেছেন :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

'আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।'[২৯]

২৮. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫৩।

২৯. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৮২।

দাওয়াতের পথে

“

‘পার্থিব জীবনের মলিনতা আর আল্লাহর ভয় আমাকে বের করেছে দাওয়াতের পথে। এমন কাজে ব্যয় করি জিন্দেগির সময়গুলো যার কোনো নগদ মূল্য নেই। দুনিয়ার লাভ আর আখিরাতের সাওয়াব তুলনা করে আমি দেখেছি—আল্লাহর কসম! উভয়ের মধ্যে কোনো তুলনা হয় না।’

‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর—যিনি আমাদের এখানে সমবেত করেছেন। আমরা কোনো মূর্তির পূজা করি না, তাওয়াফ করি না কোনো কবর কিংবা পবিত্র ভাবি না কোনো বৃক্ষকে। আল্লাহ তাআলা তাওহিদের বন্ধনে আমাদের আবদ্ধ করেছেন। আমরা ইবাদত করি মহান রবের—যিনি একক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান; যার কোনো শরিক নেই।

আমার ভাইয়েরা! এমন অনেক মানুষ আছে, যারা পূজা করে পাথরের, তাওয়াফ করে কবরের চারপাশে, হাত পাতে মৃতদের কাছে। অজ্ঞতা তাদের গ্রাস করে নিয়েছে, নানান বদ-রসম ও কুপ্রথা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মুসলমান ভাইদের অন্তরে শিরক তাঁবু গাঁড়তে শুরু করেছে।

হে ইসলামের জিম্মাদারগণ! কোথায় আপনারা? কোথায় আপনাদের দ্বীনের দাওয়াত?

কী হয়ে গেল আপনাদের? পথে নামতে এত গড়িমসি কেন?

আপনারা ছাড়া তাদের কাছে দাওয়াত কে নিয়ে যাবে?’

তারাবিহর সালাতের পর সমবেত মুসল্লিদের বয়ান করছেন নবাগত শাইখ। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। তার সুমধুর আহ্বান নাড়া দিচ্ছে চেতনার মর্মে। অন্তরে জাগিয়ে তুলছে অগণিত জিজ্ঞাসা। সতেজ করে তুলছে অনুভূতিগুলোকে। প্রেরণার সঞ্চার করছে মৃতপ্রায় হৃদয়ে।

একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন। মুসলিম তরুণদের গাফিলতির কথা উল্লেখ করেন। দাওয়াতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। আমার মনে হয়, তিনি আমাকেই সম্বোধন করছেন। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকি শাইখের উদাত্ত আহ্বান—

'আমি এখানে টাকা-পয়সার জন্য আসিনি। এসেছি আপনাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করতে, আপনাদের হিম্মতকে জাগিয়ে তুলতে এবং দাওয়াতের ফরজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ দাওয়াতের জন্য কত কুরবানি করেছেন। পাহাড়, সাগর আর মরুভূমি পাড়ি দিয়েছেন। কত কষ্ট সহ্য করেছেন। এখন তো দাওয়াতের উপায়-উপকরণগুলো একেবারেই সহজলভ্য। তবুও আমরা কী করে বসে থাকতে পারি?

হে ভাই! আমি আপনাকে বলছি না—পুরো সময়টা আপনাকে দাওয়াতে লাগাতে হবে। নাহ, শুধু কেবল আপনার অতিরিক্ত সময়টুকু। যে সময়টুকু আপনার হাতে জমে থাকে শুধু সেগুলোই দাওয়াতের কাজে ব্যয় করুন। আমাদের পূর্বসূরিগণ তাদের জীবনের পুরো সময়টা দাওয়াতের জন্য উৎসর্গ করতেন। কেবল অতিরিক্ত অংশটুকু দুনিয়ার জন্য ব্যয় করতেন।'

মসজিদে এত লোক থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, তিনি আমাকেই বলছেন—কেবল আমাকেই সম্বোধন করছেন। আমাকেই তিনি উদ্বুদ্ধ করছেন। মনে মনে সংকল্প করি—ইনশাআল্লাহ! আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। তাওহিদের এই দাওয়াতে আজ অনেক মানুষের প্রয়োজন। মুসলমানদের অবস্থা আজ বড়ই নাজুক।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমি শাইখের অপেক্ষা করি। মুসাফাহা করেই জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন। কোথায় যাব

আমি? আমি একজন ডাক্তার।' শাইখের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি আমাকে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। এই বছর আমার 'পিএইসডি'র থিসিসের কাজ করার কথা। আমি সেটি ছয় মাস পিছিয়ে দিই।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে দাওয়াতের পথে বের হই। পাড়ি দিই বন্ধুর পথ—দুর্গম পাহাড়, বিস্তীর্ণ সমতল কিছুই বাদ যায় না। আমি দেখি কবরপূজারিদের—মাজারের চারপাশে তাওয়াফকারীদের। গাইরুল্লাহর নামে পশু জবেহ্ করতে দেখে খুবই ব্যথিত হই। শিরক আর বিদআতের ভয়াবহ সয়লাব আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলে।

আমি দেখি খ্রিষ্টান যুবকদের—যারা রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষকে আপন ধর্মের দিকে আহ্বান করছে। দূরদেশে এসে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। একটি ভ্রান্ত আকিদার অনুসারীরা এত মেহনত করছে—অথচ আমরা কোথায়?

নিরলসভাবে আমরা দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আমাদের উৎসাহ ক্রমশ চাঙা হতে থাকে। ছয়টি মাস যে কীভাবে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। এখন কী করব আমি? কোথায় যাব? গভীর ভাবনায় ডুবে যাই। এখন কি আমি 'পিএইসডি' কমপ্লিট করব? তারপর কী হবে? আমি কি আবার আগের জীবনে ফিরে যাব? দাওয়াতের পথে কি আমি আবার ফিরে আসতে পারব?

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾

'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়।'[৩০]

৩০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৩।

আমি জান্নাতের দিকেই ছুটে যাব ইনশাআল্লাহ। প্রতিদিনই দাওয়াত আমাকে পৌঁছে দেবে নতুন নতুন উচ্চতায়। মানুষের হৃদয়ে আমি ইমানের চাষ করব। অন্ধকার অন্তরগুলোকে ভরে দেবো আলোতে। দাওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। এই পথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। আল্লাহ যেন আমাকে অটল অবিচল রাখেন।

মুসলিম যুবকদের নিয়ে অনেক ভাবি। মূল্যবান সময়গুলো তারা হেলায় নষ্ট করছে। একটু সচেতন হলেই তারা উম্মাহর পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। তাওহিদের বন্ধনে উম্মতকে একত্রিত করার যে নতুন আহ্বান দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এতে অংশগ্রহণ তাদের জন্য অতীব জরুরি।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্ম সূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

- আমীমুল ইহসান

একদিন থেমে যাবে জীবনের কোলাহল। মায়াবী এই জগৎ ছেড়ে সবাই পাড়ি জমাবে না ফেরার দেশে—জীবনের পরম গন্তব্যের উদ্দেশে। হয় জান্নাত নয় জাহান্নামই হবে ঠিকানা। কত স্পষ্ট কুরআনের ঘোষণা—'জীব-মাত্রই গ্রহণ করবে মৃত্যুর স্বাদ। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল দেয়া হবে পূর্ণমাত্রায়। যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।' [সুরা আলে ইমরান : ১৮৫]

যেকোনো মুহূর্তে বিদায়ের ডাক এসে যেতে পারে যে কারোই। তাই আখিরাতের পাথেয় সদা প্রস্তুত রাখতে হয়। কিন্তু পার্থিব জীবনের রূপ-রস-গন্ধে সারাক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে মানুষ। দুনিয়ার মোহে পড়ে পরকালের প্রস্তুতির কথা বেমালুম ভুলে যায় তারা। তাই মাঝে মাঝে তাদের মনে করিয়ে দিতে হয় জীবনের পরম পরিণতির কথা। শোনাতে হয় সুখময় জান্নাতের গল্প—সতর্ক করতে হয় জাহান্নামের বিভীষিকাময় অগ্নিকুণ্ড থেকে।

'স্বাগত তোমায় আলোর ভুবনে' গল্পে গল্পে আপনাদের মনে করিয়ে দেবে আল্লাহর আনুগত্যের কথা—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসার কথা। অন্তরে জাগিয়ে তুলবে আখিরাতের অতুল স্বপ্ন—জান্নাতের অমিত সম্ভাবনা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তুচ্ছ দুনিয়ার অসারতা। গল্পের ভেতর বিচরণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে আল্লাহর ভয় আর পরকালের প্রস্তুতির দুর্নিবার বাসনা।